গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ১ সংখ্যা ২৯ জুলাই - ৪ আগস্ট, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের কারাদণ্ডের জন্য সিপিএম ষড়যন্ত্র করল কেন

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য

২৪ জুলাই কুলতলির কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রবোধ পুরকাইত

কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রের দীর্ঘদিনের বিধায়ক, আমাদের দল এস ইউ সি আইয়ের প্রবীণ কৃষক নেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ আরও ৪ জন দলীয় কর্মীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে — আচমকা এই সংবাদ শুনে আপনারা সকলেই বিস্ময়ে হতচকিত। উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হয়ে আমাদের দলের বক্তব্য জানার জন্য বহু মানুষ আমাদের কর্মীদের প্রশ্ন করেছেন, দলের অফিসে ফোনও করেছেন। এই ঘটনার নেপথ্যে যে সিপিএম নেতৃত্বের ষড়যন্ত্র কাজ করছে, একথা আমরা রায় ঘোষণার দিনই এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছি। কিন্তু অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমে আমাদের বক্তব্য আংশিক বা অসম্পূর্ণভাবে এবং সিপিএম প্রভাবিত টিভি ও সংবাদপত্রে অসত্য ও বিকৃতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সেজন্য সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য আপনাদের জানানো আমরা কর্তব্য বলে মনে করছি।

কেন আমরা সিপিএমের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলছি? কারণ, ১৯৮৫ সালের একটি ঘটনায় তৎকালীন কংগ্রেসী ও পরে সিপিএম হওয়া একদল দুষ্কৃতী হত্যার উদ্দেশ্যে আমাদের দলের একজনকে গুলি করে এবং তার ফলে উত্তেজিত জনতার হাতে দু'জন দুষ্কৃতী প্রাণ হারায়। এর সাথে প্রবোধ পুরকাইত ও অন্য দণ্ডপ্রাপ্তরা জড়িত না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ-প্রশাসন সিপিএমের নির্দেশে তাঁদের জড়িয়ে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। সেসন কোর্টে ১২ বছর মামলা চলার পর ১৯৯৭ সালে কোর্ট প্রবোধবাবু সহ ৩৩ জনকে নির্দোষ বলে রায় দিয়ে বেকসুর খালাস দেয়। কিন্তু যে ৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন দণ্ড দেওয়া হয়, আমরা তাঁদের মুক্তি দাবি করে হাইকোর্টে আপিল করি। আমাদের ওই আপিলের শুনানি চলার সময় অকস্মাৎ দেখা গেল, প্রকৃত অভিযোগকারীরা নয়, স্বয়ং সরকারি উকিল প্রবোধবাবুদের দণ্ড চেয়ে একটি আপিল নিয়ে অতি তৎপর হয়ে উঠলেন। সরকারি উকিলের অতি সক্রিয়তার ফলে আমাদের আপিলের শুনানির সাথে সরকারি আপিল যুক্ত করে দেওয়া হল এবং এই জুলাই মাসে শুনানিও শুরু হল। প্রবোধ পুরকাইতদের পক্ষে প্রবীণ ও বিশিষ্ট আইনজীবী দিলীপ দত্ত দাঁড়ান, কিন্তু তিনি মাত্র ২ দিন, ৭ ও ৮ জুলাই সওয়াল করার সুযোগ পেলেন, এরপরই শুনানি শেষ করে দেওয়া হল এবং ২০ জুলাই প্রবোধ পুরকাইতদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায়ও ঘোষিত হয়ে গেল।

আপনাদের স্মরণ করাতে চাই যে, ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে ঐ ঘটনার পর, বিশিষ্ট আইনজীবী, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজ্যসভার সদস্য প্রয়াত দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ঐ গ্রামে যান। তাঁরা সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে জানান যে, দু'জনের মৃত্যু জনরোষেরই ফল, এবং ঐ ঘটনার সাথে প্রবোধ পুরকাইত কোনভাবেই জড়িত নন। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের দীর্ঘদিনের ও বর্তমান এমপি, আর এস পি নেতা সনৎ মণ্ডলও ঘটনাস্থল ঘুরে বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, ঐ ঘটনায় প্রবোধবাবু জড়িত ছিলেন না। আনন্দবাজার সহ কিছু সংবাদপত্রও সেদিন লিখেছিল, ঘটনার সময় প্রবোধবাবু ছিলেন না।

আদালতের বিচার ও রায় সম্পর্কে আইনত আমাদের কিছু বলা চলে না। কিন্তু ২০ বছর পর, প্রকৃত অভিযোগকারীদের বাদ দিয়ে স্বয়ং সরকারি উকিল যেভাবে তড়িঘড়ি এই আপিল মামলার ক্ষেত্রে অতি সক্রিয়তা দেখালেন, তা আদৌ স্বাভাবিক ঘটনা নয় এবং এর দ্বারা আরও পরিষ্কার হয় যে, এর পিছনে সিপিএমের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কাজ করেছে।

চারের পাতায় দেখুন

কুলতলিতে কী ঘটেছিল ? সরেজমিন অনুসন্ধানকারীদের অভিমত

১৯৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারি কুলতলি থানার রাধাবল্লভপুরে উত্তেজিত জনতার হাতে দু'জন কংগ্রেস(ই) দুষ্কৃতী'র নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। জনরোষের বলি এই দুটি অবাঞ্ছিত হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে আমাদের দল এস ইউ সি আই'র বিরুদ্ধে সুদূরপ্রসারী ও সুগভীর এক ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হয়। আমাদের দলের কুলতলি কেন্দ্রের বিধানসভা সদস্য, চাষী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সংগ্রামী নেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ বহু বিশিষ্ট পার্টি সংগঠক ও কর্মীকে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে মিথ্যা অভিযোগে জড়িয়ে দেওয়া হয়। অথচ প্রবোধবাবু বা এস ইউ সি আই'র নেতৃস্থানীয় কোন সংগঠক বা কর্মী সেইসময়ে ঘটনাস্থলে ছিলেন না। হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর প্রবোধবাবু ঘটনাস্থলে আসেন এবং উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। সেসন কোর্টে দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এই মামলা চলার পর ১৯৯৭ সালে কোর্ট সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রবোধবাবু সহ ৩৩ জনকে নির্দোষ বলে রায় দিয়ে বেকসুর খালাস দেয়।

সকলেই জানেন, কুলতলি-জয়নগর এলাকায় কুখ্যাত জোতদার ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে গরিব চাষী, বর্গাদার, ভূমিহীন খেতমজুরদের বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই সংগঠনকে ভাঙার জন্য জোতদার, কায়েমী স্বার্থবাদীরা দীর্ঘকাল থেকে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই সমস্ত জোতদার, কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও তাদের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আগে কংগ্রেসে ছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসার পর এরাই সিপিএম হয়েছে এবং এই এলাকায় বর্তমানে এইসব জোতদার, কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীই সিপিএমের প্রধান শক্তি। কংগ্রেস সমর্থক ঐ নিহত ব্যক্তির পরিবারও যথারীতি সিপিএমে যোগ দেয়, ঐ পরিবারের একজন বর্তমানে সিপিএমের জেলা পরিষদেরও সদস্য। ফলে দেখা যায়, সেসন কোর্টের রায় বেরোবার দীর্ঘ ৮ বছর পর মূল অভিযোগকারীরা নয়, হঠাৎ সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের সরকারী উকিল তৎপর হয়ে প্রবোধবাবুদের শাস্তি চেয়ে হাইকোর্টে একটি আপিল করে এবং ২০ জুলাই হাইকোর্ট প্রবোধবাবুদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়।

সুদীর্ঘ ৫৭ বছর ধরে এস ইউ সি আই'র রাজনীতি এবং এই দলের কর্মীদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করে, এস ইউ সি আই যে এইরকম একটি ঘটনা ঘটাতে পারে স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, এই ঘটনা জনমনে প্রচুর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে এবং আমাদের শুভানুধ্যায়ী, সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের অনেকেই দলের কর্মীদের কাছে প্রকৃত ঘটনা জানতে চেয়েছেন। সেইসময়ে প্রাক্তন এমপি, প্রখ্যাত আইনজীবী, প্রয়াত শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি, এ পি ডি আর-এর নেতৃত্বে একটি এবং বামফ্রন্টের শরিক আর এস পি'র স্থানীয় এমপি সনৎ মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি — মোট তিনটি পৃথক তদন্তকারী দল ঘটনাটি সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করে তিনটি পৃথক রিপোর্ট পেশ করে। জনসাধারণের অবগতির জন্য সেই তিনটি রিপোর্টই আমরা এখানে হুবহু প্রকাশ করছি। এর থেকেই জনগণ প্রকৃত ঘটনা জানতে পারবেন।

প্রাক্তন এম পি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কুলতলি পরিদর্শন

[প্রাক্তন এম পি শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের নেতৃত্বে জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীতপন সিকদার, সিপিআই(এম-এল)-এর পশ্চিমববঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীআলোক মুখার্জী গত ২৪শে জানুয়ারি কুলতলি পরিদর্শন করে এসে ২৫শে জানুয়ারি কলকাতার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের বক্তব্য রাখেন এবং একটি লিখিত প্রেস বিবৃতি দেন। আমরা পূর্ণ প্রেস বিবৃতিটি এখানে প্রকাশ করলাম।

সাংবাদিক সম্মেলনে এঁরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রীশান্তিময় চ্যাটার্জি (চেয়্যারম্যান, ডি এম কে পি, পশ্চিমবঙ্গ), শ্রীঅনিল গাঙ্গুলি (ওয়ার্কার্স পার্টি), শ্রীমতী মাধুরী সেনগুপ্ত (সিপিআই এম এল, সি পি আর)]

কুলতলির ঘটনা সম্পর্কে যে সংবাদ প্রতিদিন কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ফলে নিরপেক্ষ তদন্তের মধ্য দিয়ে সত্য নিরূপণের জন্য ২৪শে জানুয়ারি কুলতলি পরিদর্শন করি।

সাতের পাতায় দেখুন

৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষ
স্মরণদিবসে
সমাবেশ
রানি রাসমণি রোড ● বিকাল ৪টা
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ
সভাপতি ঃ কমরেড মানিক মুখার্জী

১ - ৩ আগস্ট
কোটেশন একজিবিশন
মহাবোধি সোসাইটি হল
(কলেজ স্কোয়ারের নিকট)
সকাল ১০টা - রাত্রি ৮টা

বহরমপুরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সেমিনার

সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরাম মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে ''বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের নয়া মুখোশ'' শীর্ষক এক সেমিনার ৩ জুলাই বহরমপুরের গ্রান্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরী। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রাইহান বিশ্বাস।

সেমিনারে সাংস্কৃতিক ও নাট্য আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী অভিজিৎ সরকার তাঁর বক্তব্যে দেখান, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ কীভাবে সুস্থ সংস্কৃতিকে সঙ্কুচিত করছে তা দেখান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক বাসুদেব চ্যাটার্জী এবং 'বিজ্ঞান ভাবনা'র সহ সভাপতি মহম্মদ সেলিম।

রাজ্য কমিটির প্রতিনিধি অমিতাভ চ্যাটার্জী তাঁর বক্তব্যে দেখান যে, 'বিশ্বায়ন' শব্দটি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরাই আমদানি করেছে তাদের শোষণ-লুণ্ঠন ও দমনের রাজনীতিকে আড়াল করার জন্য। 'সংস্কার' 'উন্নয়ন' ইত্যাদি শব্দগুলিও মানুষের মনে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে যাতে শ্রেণীগত চিন্তা, শ্রেণীশোষণ, উন্নয়নের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কিত ভাবনা-ধারণা লোপ পায়।

'উন্নয়ন' শব্দটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে মনে হবে, সমাজে যেন আর ধনী-গরিব, শোষক-শোষিতের বিভাজন নেই, সকলেই একাসনে চলে এসেছে, এখন যেন চেষ্টা করলেই যে কেউ উন্নতি করতে পারে, ধনবান হতে পারে। যে বা যারা তা পারবে না, ধরে নিতে হবে তারা অযোগ্য, অক্ষম। অর্থাৎ উন্নয়নের প্রশ্নের সাথে একটা দেশের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার যেন কোন সম্পর্ক নেই অথবা আগে থাকলেও, এখন 'বিশ্বায়ন' যেন তা মুছে ধ্বংস করছে, কিছু অভিনেতাকে কিনে নিয়ে কীভাবে বিচ্ছিন্ন করছে সমাজ থেকে এবং সাধারণ মানুষ থেকে। তিনি বলেন, সহজ সরলভাবে নাটককে গ্রামস্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের (নবপর্যায়) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুগত বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে শ্রমজীবী মানুষের উপর কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন তার আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তা দেখান এবং বলেন, আজ যাঁরা চাকরি করছেন তাঁদের আগামীকাল কাজ থাকবে কি না তার গ্যারান্টি নেই। ভেষজ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা ডঃ বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী তাঁর বক্তব্যে পেটেন্ট আইন মানুষের চিকিৎসার সুযোগকে কীভাবে দিয়েছে। এই মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হলে, শ্রেণীচিন্তাকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপনা করে দেখাতে হবে যে, এই বিশ্বায়ন বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া কিছু নয়।

প্যালেস্টাইন জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতা ইয়াসের আরাফত এবং ইরাকের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন কমিটির সদস্য গৌতম সাহা। আগামী ৯ আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বত্র নাগাসাকি দিবস পালনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন তরুণ শিক্ষক মফিদুল ইসলাম। ওই কর্মসূচি গৃহীত হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুর

এ আই ডি এস ও'র জেলা ক্যাম্প

এ আই ডি এস ও'র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ৯ এবং ১০ জুলাই বালুরঘাট হাইস্কুলে জেলা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০৫ জন প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্প উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক কমরেড সাগর মোদক। দু'দিনের এই ক্যাম্প পরিচালনা করেন এ আই ডি এস ও'র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল সাহু। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড দীনেশ মহন্ত। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বি এড কলেজের অধ্যাপক কমরেড প্রভাস মণ্ডল এবং এ আই ডি এস ও'র জেলা সহ-সভানেত্রী কমরেড নমিতা মহন্ত।

৯ জুলাই খেলাধূলা-শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে ক্যাম্পের সূচনা হয়। এরপর প্রতিনিধিরা গান, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশন করেন। ১০ জুলাই সকালে ফুটবল খেলা ও শরীরচর্চার পর প্রতিনিধিরা শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষার উপর কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের আক্রমণের প্রতিবাদে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান কমরেড গোপাল সাহু। 'চেতনা' বিজ্ঞান সংস্থার কর্মীরা ডাঃ সুদীপ্ত তরফদারের নেতৃত্বে কুসংস্কাররোধী বিভিন্ন বিষয় প্রদর্শন করে দেখান। শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর জীবনের উপর নির্মিত সিনেমা 'শহীদ' সকলের মনে গভীর আবেগ এবং অনুভূতির সৃষ্টি করে।

ফি-বৃদ্ধির সুপারিশের কপি পোড়াল এ আই ডি এস ও

উচ্চশিক্ষায় ব্যাপকহারে ফি বাড়ানোর যে সুপারিশ পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস কমিটি করেছে তার বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গব্যাপী ১৮-২৩ জুলাই দাবি সপ্তাহ পালন করে। ২০ জুলাই কলকাতার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং কান্তি বিশ্বাস কমিটির শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী সুপারিশের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। অটোনমাস করার পদক্ষেপ হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে পোস্ট গ্রাজুয়েট-এ ভর্তির ফর্মের দাম ১৫০ টাকা করার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় এবং কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অন্যান্য জেলাতেও অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয়।

ঝাড়খণ্ডে হুল-এর ১৫০তম বর্ষ উদ্‌যাপন

এস ইউ সি আই-এর পূর্ব সিংভূম জেলার পোটকা লোকাল কমিটির উদ্যোগে সাঁওতাল বিদ্রোহ (হুল)-এর ১৫০তম বর্ষ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজিত হয়। হলুদপুকুর এবং কালিকাপুর সাপ্তাহিক বাজারে সাধারণ মানুষকে বিদ্রোহের নেতা সিধু-কানুর ছবি সম্বলিত ব্যাজ পরানো হয় এবং সংগঠনের দ্বারা প্রকাশিত সিধু-কানুর জীবন সংগ্রাম আধারিত বই বিক্রি করা হয়। বাজারে উপস্থিত জনতা আগ্রহের সঙ্গে ব্যাজ পরেন এবং বই কেনেন। ৩০ জুন হুল দিবসে কোয়ালী সাপ্তাহিক বাজারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহিলা নেত্রী কমরেড সনকা মাহাতো ও বীরেন ভকত বক্তব্য রাখেন। সভায় কমরেড কমলিনী সরদার ও উপাসিনী সরদার সিধু-কানুর উপর স্বরচিত গান পরিবেশন করেন।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সভা

গত ১৪ই জুলাই ত্রিপুরা হিতসাধিনী হলে কলকাতা জেলার ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সমর্থক রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর আসন্ন রাজ্য সম্মেলন (২-৪ ডিসেম্বর) সফল করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের করণীয় কাজ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন — আজ শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনকে নিছক আর্থিক দাবিদাওয়া আদায়ের আন্দোলনে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলন ও নেতৃত্বকে লড়তে হবে শ্রমিকশ্রেণীর মূলশত্রু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার ধারক বাহকদের বিরুদ্ধে। শ্রমিক আন্দোলন, দেশের ভিতরে বা বাইরে যেখানেই হোক না কেন, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে তা গড়ে না উঠলে শ্রমিকদের অবস্থার মূলগত কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না। আর সে কাজে শোষিত, নিপীড়িত, নিরন্ন শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ হল পূর্বশর্ত। আজ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নিজস্ব আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি আধা-সরকারি, বেসরকারি শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজেও সামিল হতে হবে। এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিধান চ্যাটার্জী। বিভিন্ন অফিসের কর্মচারীরা রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক নানা আক্রমণের স্বরূপ তুলে ধরেন।

কৃষক-খেতমজুরদের পানীয় জলের দাবি আদায়

কৃষিজমির বর্ধিত খাজনা বাতিল, সমস্ত গরিব মানুষকে বিপিএল কার্ড প্রদান, অসেচ এলাকায় সেচ এলাকার খাজনা বাতিল করার দাবি সহ ১০ দফা দাবিতে ১১ জুলাই দেড় শতাধিক কৃষক-খেতমজুর ইছাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইছাপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড গঙ্গা গঁড়াই। কে কে এম এস-এর বর্ধমান জেলার নেতা কমরেড দনা গোস্বামীর নেতৃত্বে কমরেডস্ প্রভাতী গোস্বামী, ননুলাল সরেন, রূপলাল টুডু, খোকন গঁড়াই পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। তিনি অবিলম্বে পানীয় জল সরবরাহের দাবি মেনে নেন এবং অন্য দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন। এই কর্মসূচি স্থানীয় কৃষক-খেতমজুর সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

নামখানায় ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নামখানা বাজার থেকে চন্দনপীড়ির পাকাবাড়ি বাজার পর্যন্ত যাত্রী পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম অটো-রিক্সায় অস্বাভাবিক ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন সাধারণ মানুষ। অটো মালিকদের দাবি বিবেচনার জন্য ৭ জুন নামখানা বিডিও অফিসের সামনে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিরা প্রতি স্টেজে ১ টাকা হারে ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। এস ইউ সি আই প্রতিনিধি ৫০ পয়সা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের জোরে অটো মালিকরা ১ টাকা হারে ভাড়াবৃদ্ধি ঘোষণা করে চালাতে থাকেন।

৩০ জুন ১০ জনের এক প্রতিনিধিদল বিডিও'র কাছে এর প্রতিবাদ জানিয়ে গণস্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র পেশ করে। প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন নামখানা পরিবহন যাত্রী কমিটির সম্পাদক কমলেন্দু পানি ও প্রতিভা মিশ্র।

২ জুলাই প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে চন্দনপীড়ি পাকাবাড়ি বাজারে কয়েকশ' মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত যাত্রী কনভেনশনে সজল বেরাকে সভাপতি এবং বিমল তিয়াড়ি ও বিপ্লব দাসকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করে যাত্রী কমিটির চন্দনপীড়ি শাখা গঠিত হয়। ৫ জুলাই পথ অবরোধে সহস্রাধিক মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হন। এস ইউ সি আই বাদে সব রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব এখন সরাসরি ভাড়াবৃদ্ধির পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম-এর জেলা সম্মেলন

গত ৯ জুলাই ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ-এর কলকাতা জেলা সম্মেলন মহাবোধি সোসাইটি হলে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড অরূপ রতন সাহা। ব্যাঙ্ক শিল্পে কর্মচারী স্বার্থবিরোধী অষ্টম দ্বিপাক্ষিক বেতনচুক্তির নিন্দা এবং মার্জার, ডিপ্লয়মেন্ট, আউটসোর্সিং, কোরব্যাঙ্কিং, ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ এবং শ্রম সঙ্কোচন ও শ্রমিক ছাঁটাই-এর চক্রান্তের বিরোধিতা করে মূল প্রস্তাব পেশ করেন কমরেড বসন্ত কুমার রায়। সম্মেলনের মূল বক্তা, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ-এর সভাপতি কমরেড অমর রায় এবং অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল, কর্মচারীদের জীবন ও জীবিকার উপর সরকার ও কর্তৃপক্ষের যৌথ আক্রমণের বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, এই সর্বনাশা আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারলে ৮০ শতাংশ কর্মচারী কাজ হারাবে। তাঁরা আলোচনায় এও দেখান যে, এআইবিইএ, এনসিবিই, বিইএফআই প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ব্যাঙ্ককর্মচারীদের জীবন ও জীবিকার উপর এই আক্রমণ নেমে এসেছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। সম্মেলন থেকে কমরেড বঙ্কিমচন্দ্র বেরাকে সভাপতি ও কমরেড বসন্ত কুমার রায়কে সম্পাদক নির্বাচন করে কুড়ি সদস্য বিশিষ্ট কলকাতা জেলা কমিটি গঠিত হয়।

কৃষিতে বর্ধিত মাশুল ও বিদ্যুৎ বিল পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী ২০০৫ বাতিলের দাবিতে

১৯ জুলাই জেলায় জেলায় পথ অবরোধে পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার

প্রতিবাদে শেওড়াফুলি, আমডাঙা, অশোকনগর, হাবড়ায় বন্‌ধ

হুগলি

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মঙ্গলবার অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) ডাকে বিদ্যুৎগ্রাহকরা শেওড়াফুলি ফাঁড়ির সামনে পথ অবরোধ করলে বেধড়ক লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এতে ১৫ জন জখম হন, দু'জনের মাথার আঘাত গুরুতর। সেখান থেকেই কয়েকজন ছাত্রছাত্রীসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরের দিন শ্রীরামপুর মহকুমা আদালতে কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁদের হাজির করা হলে লক-আপে পুলিশের অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

পথ অবরোধে লাঠিচার্জের পর জখম ছাত্রছাত্রীদের তুলে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামপুর থানার লক-আপে রাতভর পুলিশ নির্যাতন চালিয়েছে। লক আপে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর সঙ্গে পুলিশ অশালীন ব্যবহার করেছে। এমনকী তাঁকে খেতেও দেওয়া হয়নি। এক ছাত্রকে মেঝেতে ফেলে ভারী বুট দিয়ে তার বুকে লাথি মারা হয়।

অবরোধে অংশ নেওয়ায় ধৃত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সবিতা সিংহ বলেন, পুলিশের মারে আমার উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না। সেই অবস্থাতেই আমাকে পুলিশ অন্যান্যদের সঙ্গে গাড়িতে তোলে। সে সময় কোনও মহিলা পুলিশ ছিল না। হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে আমাদের শ্রীরামপুর থানা লক-আপে ঢোকানো হয়। সারারাত খেতে না দিয়ে অকথ্য অত্যাচার চলে। সবিতা বলেন, রাতে মহিলা পুলিশ ছাড়াই এক অফিসার লক-আপে ঢোকেন। অশ্রাব্য ভাষায় দীর্ঘক্ষণ গালিগালাজ দেন। চড়-থাপ্পড়ও মারা হয়। তাঁর কথায়, আমার ওপর অতি জঘন্য ব্যবহার করেছে পুলিশ। অ্যাবেকার জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরি, আইনের ছাত্র সমীরণ বসু, ভোলা রায়, মহাদেব কোলে প্রমুখের অভিযোগ — চড়-থাপ্পড় দিয়ে অত্যাচার শুরু হয়, তারপর গালিগালাজ, লাথি কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। প্রদ্যুৎ চৌধুরীর অভিযোগ, বরফ চাইতেই এক পুলিশ অফিসার সজোরে পেটে লাথি মারেন। সকলেরই অভিযোগ, এসব কথা বাইরে বললে ফের লক-আপে এনে পেটানো হবে বলে পুলিশ অফিসাররা শাসিয়েছেন। অবরোধ ছিল শান্তিপূর্ণ। অথচ পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দিয়েছে। ফলে তাঁদের ১৪ দিন জেল হাজত দেওয়া হয়েছে। গণআন্দোলনে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে ২০ জুলাই ১২ ঘণ্টা শেওড়াফুলি বন্‌ধ পালিত হয় এবং ২১ জুলাই চুঁচুড়া কোর্ট মোড়ে ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনস্বার্থে আন্দোলনরত কর্মীদের আইনি বেড়াজালে আটকে দিয়ে গণআন্দোলন ধ্বংস করার সিপিএম-ফ্রন্টের এই অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছেন সাধারণ মানুষ।

জনগণকে অ্যাবেকার অভিনন্দন

কৃষিতে অস্বাভাবিক হারে বর্ধিত মাশুল ও স্বৈরতান্ত্রিক বিদ্যুৎ বিল পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী ২০০৫ বাতিল এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও ক্ষুদ্র শিল্পে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেবার দাবিতে ১৯ জুলাই অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উত্তরবঙ্গের চারটি জেলা বাদে অন্যান্য জেলায় এক ঘণ্টা প্রধান সড়কগুলি অবরোধ করে বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা বিক্ষোভ জানায়। অ্যাবেকার এই আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল এস ইউ সি আই।

বিক্ষোভকারীদের উপর বিভিন্ন জায়গায় লাঠিচার্জ করা হয়েছে। সব সমেত গ্রেপ্তার হয়েছেন ২১৬ জন, আহত ৫১ জন। শেওড়াফুলিতে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত ৫ জনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। এছাড়া বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, আমডাঙা, হাবড়া অশোকনগর, মেদিনীপুর এবং কলকাতায় লেনিন সরণী-চৌরঙ্গির মোড়ে অবরোধ-কারীদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে।

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস এক বিবৃতিতে শান্তিপূর্ণ অবরোধকারীদের উপর নির্বিচারে লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার কৃষক এবং সাধারণ বিদ্যুৎগ্রাহক রাস্তা অবরোধ করে যে ব্যাপক বিক্ষোভ জানিয়েছে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্য সরকার যদি দাবি মেনে নেয়, সেটা হবে আনন্দের কথা; আর তা না হলে ১ আগস্ট থেকে রাজ্যব্যাপী কৃষিতে বিদ্যুৎ বিল বয়কট শুরু হবে এবং ২৫ আগস্ট মহাকরণ অবরোধ করা হবে।

উত্তর ২৪ পরগণা

হাবড়া, অশোকনগর, মছলন্দপুর, গাইঘাটা ও আমডাঙায় কোথাও ২০০, কোথাও ৪০০, কোথাও ৫০০ জন বিদ্যুৎগ্রাহক সমবেত হয়ে পথ অবরোধ শুরু করেন। আধঘণ্টা পরই বিশাল পুলিশবাহিনী এসে আচমকা লাঠিচার্জ শুরু করে।

হাবড়ায় পথ অবরোধ (ইনসেটে) লাঠিচার্জে আহত মহিলাকর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

কলকাতার চৌরঙ্গিতে পথ অবরোধ

নৃশংস লাঠিচার্জে বহু সাধারণ বিদ্যুৎগ্রাহক আহত হন। হাবড়ায় এমনকী মহিলা কর্মীদেরও পুরুষ পুলিশরা রাস্তায় ফেলে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েন রত্নসম্ভবা কুণ্ডু। অন্যরা গুরুতরভাবে আহত হন। পুলিশের এই ন্যক্কারজনক আচরণের প্রতিবাদে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রতিবাদে পরদিন ২০ জুলাই হাবড়া, অশোকনগর ও আমডাঙায় অ্যাবেকার ডাকে ১২ ঘণ্টার বন্‌ধ পালিত হয়। সাইকেল মিছিল করে বন্‌ধের দিন সকালে প্রচার করার সময়ও ১০ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে অশোকনগর থানার পুলিশবাহিনী। এত বিরোধিতা সত্ত্বেও বন্‌ধ হয় সর্বাত্মক। এই আন্দোলন এলাকায় বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

কৃষ্ণনগরের পালপাড়া মোড়ে পথ অবরোধ

নদীয়া

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, দেবগ্রাম এবং করিমপুরে পথ অবরোধ হয়। কৃষ্ণনগরের পালপাড়ায় ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন প্রায় দুই হাজার চাষী। পুলিশ অবরোধ তোলার চেষ্টা করে কিন্তু চাষীদের আন্দোলনমুখী মানসিকতা দেখে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য চন্দন চক্রবর্তী অবরোধে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে, তাঁরা কোন অবস্থাতেই বাড়তি বিল দেবেন না। আগামী ১ আগস্ট থেকে সর্বস্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা লাগাতার বিল বয়কট আন্দোলন শুরু করবেন।

করিমপুর বাসস্ট্যান্ডে রঞ্জিত অধিকারী এবং আজাদ রহমানের নেতৃত্বে বিদ্যুৎগ্রাহকরা রাস্তা অবরোধ করেন। দেবগ্রামে সহস্রাধিক চাষী বিদ্যুৎ পর্ষদের স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টের অফিসে ডেপুটেশন দেন। সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যান্যদের সাথে বক্তব্য রাখেন কালীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ এবং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি এক সিপিএম নেতা। এরপর হাজার হাজার চাষীর ঐ সুসজ্জিত মিছিল দেবগ্রাম চৌরাস্তায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। বিশাল পুলিশবাহিনী প্রথমেই লাঠি উঁচিয়ে এসে অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করে কিন্তু চাষীদের প্রবল প্রতিরোধে পিছু হটতে বাধ্য হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক ঘণ্টা অবরোধের পর নেতৃত্ব অবরোধ তুলে নেন। অবরোধে নেতৃত্ব দেন হররোজ আলী, জগন্নাথ ঘোষ, মহিউদ্দিন, দোয়াবক্স সেখ এবং কামালউদ্দিন।

হাওড়া

দাশনগর সানপুর চৌরাস্তায় অ্যাবেকা'র নেতৃত্বে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পথ অবরোধে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে, ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। এক জনের আঘাত গুরুতর।

দাশনগর সুজাতা সিনেমার সামনে ৪ শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক পথ অবরোধ করেন। এখানে ৩৩ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এছাড়া উলুবেড়িয়া মহকুমার শ্যামপুর তিন রাস্তার মোড়ে শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক পথঅবরোধ করেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, অবরোধ চলার সময় সমস্ত জায়গায় সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবরোধে অংশগ্রহণ করেন।

বীরভূম

১৯ জুলাই বেলা ২টায় সিউড়ীতে রাস্তা অবরোধ শুরু হয়। বিরাট সংখ্যক পুলিশ বাহিনী লাঠি-বন্দুক-টিয়ার গ্যাসে সজ্জিত হয়ে মোতায়েন ছিল। অবরোধ শুরু হওয়া মাত্রই তারা শান্তিপূর্ণ অবরোধকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের এলোপাথাড়ি মার সত্ত্বেও বিক্ষোভকারীদের দৃঢ়তা এবং জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দেখে পুলিশ সাময়িকভাবে পিছিয়ে যায় এবং আরও বিশাল সংখ্যায় এসে বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করে অবরোধ ভেঙে দেয়। পুলিশের লাঠিচার্জে ৭ জন আহত হন।

মেদিনীপুর

১৯ জুলাই মেদিনীপুর জেলার ৮টি স্থানে হাজার হাজার বিদ্যুৎগ্রাহক পথ অবরোধ করেন। পাঁশকুড়া পুরানো বাজারে ৬নং জাতীয় সড়ক, মেছেদায় ৪১নং জাতীয় সড়ক, ময়নার হোগলাবাড়ি মোড়, বাজকুল চৌরাস্তা, ঘাটাল-পাঁশকুড়া রোড, সবং-এ তেমাথানি মোড়, মেদিনীপুর শহরে কালেক্টরেট মোড় এবং এগরার কাঁথি-মেদিনীপুর রোড অবরোধ করা হয়। এগরায় পুলিশ অবরোধকারীদের উপর লাঠিচার্জ করলে ৫ জন বিদ্যুৎগ্রাহক আহত হন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিপ্লবী সৈনিকদের কারামুক্ত করার প্রয়াসে সাহায্য করুন

একের পাতার পর

কিন্তু কেন এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র ?

প্রথমত, সম্প্রতি কুলতলি কেন্দ্রে আমাদের দলের উদ্যোগে প্রবোধ পুরকাইতের নেতৃত্বে শক্তিশালী গণআন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। রাজ্য সরকার সুন্দরবনের একটি প্রবহমান জীবন্ত নদী হুকাহারানিয়াকে মেরে দিয়ে বাঁধ তৈরি করাচ্ছে, যার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করায় সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে শো-কজ নোটিশ পর্যন্ত করেছে। আর একটি হচ্ছে, রাজ্য সরকার সাহারা কোম্পানিকে দিয়ে সুন্দরবনে দেশি-বিদেশি শিল্পপতি-ব্যবসায়ী ও ধনী ঘরের ছেলেমেয়েদের আমোদ-প্রমোদ ও নানা নোংরা ফুর্তির ব্যবস্থা করাচ্ছে। এইভাবে উক্ত এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত, সামাজিক পরিবেশ কলুষিত ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি ধ্বংস করার আয়োজন করেছে। প্রবোধ পুরকাইতের নেতৃত্বে সরকারি এই স্কিম দু'টির বিরুদ্ধে এলাকার হাজার হাজার মানুষ সামিল হয়েছেন এবং আন্দোলনের গতিবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যাতে এমনকী সিপিএমের নিচুতলার বহু লোক অংশ নিচ্ছেন। এর ফলেই আতঙ্কিত সিপিএম নেতৃত্ব গণআন্দোলনের মনোবল ভাঙার জন্য প্রবোধ পুরকাইতের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র করল। দ্বিতীয়ত, কুলতলি কেন্দ্রে প্রথমে কংগ্রেস ও পরবর্তীকালে সিপিএমের (পূর্বতন কংগ্রেসীরাই এখন সিপিএম) বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কমরেড প্রবোধ পুরকাইত এ পর্যন্ত ৯ বার নির্বাচিত হয়েছেন। সন্ত্রাস, খুন, রিগিং সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টা করেও সিপিএম আমাদের হারাতে পারেনি। এমনকী ১৯৮৫ সালের পর এ পর্যন্ত যে ৪ বার ভোট হয়েছে, প্রত্যেকবারই সিপিএম 'প্রবোধ পুরকাইত খুনি' এই কুৎসা রটিয়েও সুবিধা করতে পারেনি, জনগণের রায়ে প্রত্যেকবারই বিপুল ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। কারণ জনগণ জানেন, প্রবোধ পুরকাইত ও এস ইউ সি আই'র অন্য নেতা-কর্মীরা নির্দোষ। ইতিপূর্বে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রবোধবাবুর উপর একাধিকবার হামলা হয়েছে, তাঁকে মেরে এমন জখম করা হয়েছে যে, হাসপাতালে চিকিৎসা করে তাঁর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। ফলে, কোনভাবে না পেরে শেষপর্যন্ত সিপিএম নেতৃত্ব ষড়যন্ত্র করেছে যাতে প্রবোধ পুরকাইতের প্রার্থী হওয়ার রাস্তা বন্ধ করে জনগণের মনোবল ভেঙে দিয়ে আরও ব্যাপক সন্ত্রাস ও রিগিং করে কুলতলির আসনটি এস ইউ সি আই-এর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া যায়।

আপনারা জানেন, পশ্চিমবঙ্গে গদি দখলের লড়াইয়ে আমাদের দল সিপিএমের প্রতিদ্বন্দ্বী না হওয়া সত্ত্বেও সিপিএম নেতৃত্ব আমাদের দলকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে নানাভাবে হিংস্র আক্রমণ চালাচ্ছে। এ পর্যন্ত আমাদের দলের ১৪১ জন নেতা-কর্মীকে সিপিএম খুন করিয়েছে, আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলিতে আমাদের ৯ জন কর্মী শহিদ হয়েছেন, পুলিশ ও সিপিএম সমাজবিরোধীদের আক্রমণে আমাদের বহু কর্মী একেবারে পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন। নিহতদের অনেকেই শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-শিক্ষক — যাঁরা যৌবনেই দলের বৈপ্লবিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ পেছনে রেখে শোষিত জনগণের মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গণআন্দোলনের এতগুলি সম্ভাবনাপূর্ণ সৈনিককে তারা খুন করিয়েছে। এতেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে তারা আরেকটি জঘন্য রাস্তা নিয়েছে যা ইতিপূর্বে ব্রিটিশ শাসনে ও কংগ্রেসী আমলেও দেখা যায়নি। পারিবারিক বিরোধ, প্রতিবেশীর সাথে দ্বন্দ্বজনিত সংঘর্ষ, ডাকাত দলের ভাগ নিয়ে কোন্দল, সিপিএমের আভ্যন্তরীণ বিরোধ, জনরোষের বলি ইত্যাদির ফলে যেখানে যত খুন হচ্ছে সেখানে পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সিপিএম নেতৃত্ব প্রায়ই এমনকী দূরবর্তী এলাকার এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীদেরও খুনের আসামী বানিয়ে মামলায় ফাঁসিয়ে মিথ্যা সাক্ষীর জোরে সাজা দেওয়াচ্ছে এবং তারপর অন্য কর্মী-সমর্থকদেরও শাসাচ্ছে যে, 'এস ইউ সি আই করলে এইভাবেই জব্দ করা হবে'। এখন পর্যন্ত এইভাবে প্রবোধ পুরকাইত সহ আমাদের দলের ২৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ানো হয়েছে। এঁদের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ৫ জন ও বর্ধমানের ২ জন জেলা কমিটির সদস্যও রয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার আরও ৫৩ জন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মার্ডার কেস সাজানো হয়েছে।

এর কারণ আপনারা জানেন, এরাজ্যে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-শিক্ষক-ছাত্র-মহিলাদের নানা দাবিতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সকল জনবিরোধী নীতি ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে এস ইউ সি আই লাগাতার গণআন্দোলন করে যাচ্ছে। সর্বস্তরের মানুষ এমনকী সিপিএমের নিচুতলার সৎ কর্মী-সমর্থকরাও এই আন্দোলনগুলিতে ব্যাপকভাবে সামিল হচ্ছেন, নানাভাবে সাহায্য করছেন। শক্তিশালী আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার প্রাথমিকে ইংরেজি পুন:প্রবর্তন সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে। 'এস ইউ সি আই গণআন্দোলনের একমাত্র শক্তি', 'এই দলের ছেলেমেয়েরা সৎ, আদর্শবান, চরিত্রবান, পুলিশের মার খেয়েও সাহসের সাথে লড়ে' — এই ধারণা এরাজ্যে ও বাইরেও সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে প্রবলভাবে গড়ে ওঠায় এবং দলের প্রতি ব্যাপক ভালবাসা, আস্থা ও সমর্থনের জোয়ার সৃষ্টি হওয়ায় সিপিএম নেতৃত্ব আতঙ্কিত। তারা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের কৃপাধন্য হয়ে দীর্ঘদিন গদিতে আসীন থাকার জন্য এই রাজ্যে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ও পরবর্তীকালে কংগ্রেসী শাসনের যুগে গড়ে ওঠা সংগ্রামী ঐতিহ্য ধ্বংস করে গণআন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম স্তব্ধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু যথার্থ মার্কসবাদী দল এস ইউ সি আই এই ক্ষেত্রে বিরাট বাধা। তাই তারা ভীষণ ক্ষিপ্ত। তাই এস ইউ সি আইয়ের লড়বার শক্তি ভাঙবার জন্য সিপিএম নেতৃত্ব এত মরিয়া।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম নেতৃত্ব কীভাবে থানা-পুলিশ সবকিছু কুক্ষিগত করে ফ্যাসিস্ট কায়দায় গণআন্দোলন ধ্বংস করছে, বিরোধীদের নির্মূল করছে, এটা সকলেই জানেন। তাদের শাসনে আইনের রক্ষকরা যে নিজেরাই ভক্ষক, তাদের আশ্রিত কত খুনি-ডাকাত-স্মাগলার-নারী ধর্ষণকারী ও নারী পাচারকারী-তোলাবাজ এমনকী পুলিশের খাতায় দাগী আসামীও 'ভদ্রলোকে'র লেবেল লাগিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজেদের সমাজবিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং থানায় ওঠা-বসাও করছে, আবার তাদের নির্দেশেই বহু নির্দোষ ও গণআন্দোলনের সৈনিক মিথ্যা মামলায় ফেঁসে ও জাল সাক্ষীর জেরে জেল খাটছে, এটাও সকলেই জানেন। 'আইন নিজের পথেই চলবে' — বহুল প্রচারিত এই ঘোষণাও যে শোষকশ্রেণী ও শাসক দলের নানা ষড়যন্ত্রে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে আজ বিড়ম্বিত ও পথভ্রষ্ট হচ্ছে, এটাও অজানা নয়।

একথাও অনেকেরই হয়ত স্মরণে আছে যে, গত বছর ১৭ নভেম্বর যখন আমাদের দলের ডাকা বাংলা বন্‌ধে (কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পেট্রল-ডিজেল-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ও রাজ্য সরকারের বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি ও অন্যান্য জনবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে) ব্যাপক জনসমর্থনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন ঐদিনই সিপিএম রাজ্য সম্পাদক ক্ষিপ্ত হয়ে বারুইপুরে এক সভায় কুলতলি ও জয়নগরে আগামী ভোটে এস ইউ সি আই-কে উৎখাত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখনই আমরা বলেছিলাম, আমাদের নেতা-কর্মীদের জেলে পুরে, খুন করে, ব্যাপক সন্ত্রাস ও রিগিং করে সিট দু'টি হয়ত তারা কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা বিপ্লবী দল এস ইউ সি আইয়ের গতিরোধ করা যাবে না, গণআন্দোলনগুলিকে দুর্বল করা যাবে না। যুগে যুগে দেশে দেশে শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মুক্তি আন্দোলন, রাশিয়া-চীনে-ভিয়েতনামে ও কিউবায় বিপ্লব এবং আমাদের দেশে স্বদেশী যুগে বিপ্লববাদ — এম এল এ, এম পি'র জোরে হয়নি। হয়েছে মহান বিপ্লবী আদর্শ, উন্নত নৈতিক বল ও সংঘবদ্ধ জনশক্তির জোরে। মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় বলীয়ান হয়ে আমাদের দলও সেই পথেই এগোচ্ছে। বিপ্লবী দল হিসাবে আমরা জানি, জনগণের স্বার্থে লড়াই করতে গিয়ে আমাদের আরও বহু নেতা-কর্মী প্রাণ হারাবে, অনেকেই মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ হবে, কারও কারও ফাঁসিও হতে পারে, তবুও গণআন্দোলনের ও বিপ্লবী সংগ্রামের পথ থেকে এস ইউ সি আই-কে সরানো যাবে না।

আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হবে। দলের অন্যান্য বিচারাধীন ও দণ্ডিত নেতা-কর্মীদের ক্ষেত্রেও আইনি লড়াই চালানো হবে। সর্বোপরি জনগণের আদালতে সুবিচার চেয়ে আমাদের এই বক্তব্য উপস্থিত করছি যাতে সর্বস্তরের জনগণ সিপিএম নেতৃত্বের এই ভয়ংকর ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বত্র সোচ্চার হন। তাছাড়া জনগণ জানেন, আমরা সবসময়ই গণআন্দোলনের প্রয়োজনে, মনীষীদের স্মরণ দিবস উদ্‌যাপনের প্রয়োজনে, খরা-বন্যা-ভূমিকম্পে বিপন্ন মানুষের জন্য রিলিফ সংগ্রহের প্রয়োজনে এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজনেই শুধুমাত্র জনগণের কাছ থেকেই অর্থসংগ্রহ করি। অন্য কোন দল এভাবে জনগণের কাছে হাত পাতে না, তারা মালিক ও বড় ব্যবসায়ীদের টাকাতে চলে। এবারও এতজন নেতা-কর্মীকে বাঁচানোর প্রয়োজনে আপনাদের কাছে ব্যাপক আর্থিক সাহায্য চাইছি। আমরা আশা করি, এই বিপ্লবী সৈনিকদের কারামুক্ত করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করতে জনগণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা
এস ইউ সি আই অফিস
৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৪১৮২৮ ২২৪৪২২৩৪

প্রেসিডেন্সির গেট থেকে মন্ত্রীর ফিরে যাওয়ার কোনও বাধ্যতা ছিল না

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি এন জি ও-র অর্থে তৈরি কম্পিউটার-সেন্টার উদ্বোধন করার জন্য ২২ জুলাই উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তীর ওই কলেজে আসার সূচি যেমন পূর্বঘোষিত ছিল, তেমনই ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র তরফ থেকেও আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল, মন্ত্রীর দেখা পাওয়ার সুযোগ পেয়ে ওইদিন তারা মন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভর্তির ফর্ম থেকে শুরু করে বার্ষিক টিউশন ফি ব্যাপক হারে বাড়ানো হয়েছে, সেল্ফ-ফিনান্সিং কোর্সের নামে বিভিন্ন বিভাগে ফি-বৃদ্ধি ঘটেছে বিপুল — যা গরিব মেধাবী ছাত্রদের কাছে উচ্চশিক্ষার দরজা বন্ধ করে দেবে। এর বিরুদ্ধেই ডি এস ও-র প্রতিবাদ, এগুলি প্রত্যাহারের দাবিতেই তাদের স্মারকলিপি। এ'জন্য কলেজের অনুষ্ঠানে কোনরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করার বা মন্ত্রীকে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাধা দেওয়ার কোনও কর্মসূচি বা অভিপ্রায় ডি এস ও-র ছিল না, তা থাকার কারণও ছিল না। ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল মন্ত্রীকে শুধু স্মারকলিপিটি দেওয়া।

প্রেসিডেন্সির গেটের সামনে মন্ত্রী এলে উপস্থিত ছাত্ররা গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকে এবং একদল ছাত্র মন্ত্রীর গাড়ির কাছে গিয়ে স্মারকলিপি গ্রহণ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানায়। মন্ত্রী প্রথমে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ছাত্রদের বারংবার অনুরোধে অবশেষে তিনি তা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি অনায়াসেই কলেজে ঢুকতে পারতেন ; ডি এস ও-র ছাত্ররাও তাঁকে সেই অনুরোধ জানায়। কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে মন্ত্রী তাঁর গাড়ির চালককে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এ ঘটনা থেকে একথা বলা চলে কি যে, ডি এস ও-র বাধাদানের জন্যই মন্ত্রী কলেজের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি ? বরং এটাই প্রমাণ হয় যে, মন্ত্রী মহাশয় ছাত্র আন্দোলনকে বদনাম দেওয়ার জন্যই ইচ্ছাকৃতভাবে জলঘোলা করতে চেয়েছেন।

রাইটার্সে ফিরে মন্ত্রী সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, ওভাবে স্মারকলিপি দিতে যাওয়া ছাত্র আন্দোলনের গণতান্ত্রিক রীতি নয়। অথচ, মন্ত্রী বিলক্ষণ জানেন, ইতিপূর্বে ডি এস ও-র পক্ষ থেকে অসংখ্যবার তাঁর সাক্ষাৎ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু 'গণতন্ত্রের পূজারী' মন্ত্রী মহাশয় একটিবারও সে আবেদন মঞ্জুর করেননি, তাঁর দপ্তরে গিয়ে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়ার সুযোগ ছাত্রদের দেননি। মন্ত্রীর এহেন ভূমিকার পর ওভাবে রাস্তায় তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেবার চেষ্টা করা ছাড়া ছাত্রদের কাছে আর কোন বিকল্প উপায় ছিল কি ? তাছাড়া এভাবে মন্ত্রীকে ছাত্রদের দাবির কথা শোনানোর চেষ্টা করা ছাত্র আন্দোলনের দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ও স্বীকৃত গণতান্ত্রিক রীতি। সত্যসাধনবাবুরা ছাত্রাবস্থায় এ'ধরনের আন্দোলন করেননি কি ? অসংখ্যবার করেছেন। আজ সরকারি গদিতে বসে ছাত্রদের অনশন ভাঙতে পুলিশ পাঠানোর মধ্যে তাঁরা যেমন 'গণতন্ত্র' দেখতে পাচ্ছেন, তেমনই ডি এস ও-র অত্যন্ত গণতান্ত্রিক এই আন্দোলন পদ্ধতির মধ্যে অ-গণতন্ত্র খুঁজে পাচ্ছেন !

মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমবেত ডি এস ও'র ছাত্রছাত্রীরা

বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন্ পথে

[গত ৯ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের বাজেট পেশের আগে সেখানকার 'গণমুক্তি ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা সম্মিলিত আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে এক প্রাক-বাজেট মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান। বক্তৃতাটি সেখানকার সরকার অর্থনীতির প্রকৃতি ও রাষ্ট্রের চরিত্র এবং জনগণের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে আমাদের দেশের মানুষকে সাহায্য করবে।]

অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, আমাদের দেশে বাজেট নামক বিষয়টি প্রতিবছর হাজির হয় জনগণের কাছে ভীতিরূপে। কারণ বাজেট পেশের আগেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে। তার সাথে সরকারও বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। যেমন এবারও বাজেট ঘোষণার মাত্র কয়েক দিন আগেই কেরোসিন, পেট্রল, ডিজেল ইত্যাদির দাম বাড়ান হয়েছে। তার ফলাফলে গাড়িভাড়া, বাড়িভাড়া সহ অন্যান্য দ্রব্যাদির দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার বাজেট পাশের পরও দফায় দফায় স্পেশাল রেভিনিউ অর্ডার বা এস আর ও জারি করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ান হয়।

বাজেট ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়িয়ে দিয়ে যায়, দেশি-বিদেশি লুটেরা গোষ্ঠীর ধারাবাহিক লুটের রসদ জোগায়, সরকারের দলীয়করণ এবং তাদের প্রশ্রয়ে স্তরে স্তরে বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের দুর্নীতিমূলক দখলদারীত্বের ভিত শক্ত করে দিয়ে যায়। পরিণামে অনুপার্জিত অবৈধ আয় তথা কালো টাকার বিশাল ভাণ্ডার ১০ লক্ষ মানুষের হাতে জমা হয়। যার সিংহভাগ মন্ত্রী, এম পি, সামরিক ও বেসামরিক আমলা, ঋণখেলাপী-বিলখেলাপী-শিল্প-পতি-ব্যবসায়ীসহ ১ লক্ষ লোকের পকেটস্থ হয়।

বাজেটে প্রকৃত জনস্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থ যাচাই না করে অনর্থক প্রকল্পের পর প্রকল্পের নামে তহবিল তছরুপের আসর বসানো হয়। বিদেশ তথা সাম্রাজ্যবাদ নির্ভরতা ও তাদের অর্থলগ্নী সংস্থা বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ ইত্যাদির কর্তৃত্ব বাড়তে থাকে। তখন আবার তাদের দায়মুক্তিরও ব্যবস্থা করা হয়।

বাজেটে কোন্ জনগোষ্ঠী সম্পদের কত ভাগ সৃষ্টি করে এবং কার হিস্যা কতটা ন্যায্য তার কোন হিসাব থাকে না। বরাদ্দের খাত থাকে, কিন্তু জনস্বার্থের বিবেচনায় তার যৌক্তিকতার উপযুক্ত ব্যাখ্যা থাকে না। উন্নয়ন বাজেটেও গুরুত্ব বিবেচনায় অগ্রাধিকার থাকে না। জনগণের জীবন-মানের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টি থাকে উপেক্ষিত।

বাজেট রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব মাত্র নয়। এতে রাষ্ট্রের চরিত্র, সরকারের শ্রেণীস্বার্থগত রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক লেনদেন, সম্পদ সৃষ্টি ও বিলিবন্টন নীতিসহ জনস্বার্থের প্রশ্নে শাসকশ্রেণীর অবস্থানের প্রতিফলন ঘটে। আর গত ৩৪ বছর এদেশ যাঁরা পালাক্রমে শাসন করে আসছেন তাঁদের সকলেই লুটেরা-ধনবাদী ব্যবস্থার রসদ যুগিয়ে এসেছেন।

একটা প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া সত্যিকারের গণমুখী বাজেট প্রণয়ন সম্ভব নয়। 'গণমুক্তি ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা সম্মিলিত আন্দোলন' এই মতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। ফলে বর্তমান শাসকেরা ভাল কিছু করবে এ প্রত্যাশা নয়, বরং তাদের স্বরূপ উন্মোচন এবং কিছু বিকল্প ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যেই আজকের এ মতবিনিময় আয়োজন করা হয়েছে।

১) বাজেট নিয়ে আলোচনার শুরুতেই একটা প্রশ্ন নির্দ্বিধায় তোলা যায়, বাজেট কার জন্য ? যদি বলা হয় জনগণ, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় কোন্ জনগণ ? সেটা কি ১০ লক্ষ কালো টাকার মালিক, লুটেরা ধনপতি ? না, ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষক-ক্ষেতমজুর, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ ?

গত বছরের (২০০৪-০৫) বাজেট বিশ্লেষণ করে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমান সহ আরও কয়েকজন বাজেটের সহজপাঠ নামে একটি পুস্তিকা বের করেছেন। সেখান থেকে কিছু তথ্য নিয়ে স্পষ্ট দেখানো যায়, আমাদের দেশের শাসকশ্রেণী প্রতিবছর বাজেট বলতে আমাদের সামনে যা হাজির করে তা আসলে ওই ১০ লক্ষের জন্যই তৈরি হয়।

প্রথমত, এটা অনস্বীকার্য যে বাজেটের সিংহভাগ অর্থ যোগান দেয় ওই ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ। কীভাবে ? আমরা জানি, বাজেটের গোটা অর্থের উৎস প্রথমত রাজস্ব আয়, দ্বিতীয়ত দেশি-বিদেশি উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণ, তৃতীয়ত বিদেশি সাহায্য বা মঞ্জুরি। সবাই জানেন বর্তমানে এই সাহায্য বা মঞ্জুরির পরিমাণ খুবই নগণ্য। আর দেশি-বিদেশি ঋণ পরিশোধের পুরো দায়িত্ব বহন করে সাধারণ জনগণ।

সরকারের রাজস্ব আয়ের উৎস হল প্রত্যক্ষ কর, যার মধ্যে বড় অংশ হল আয়কর, কর্পোরেট আয়কর ; আর পরোক্ষ কর, যার মধ্যে আছে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, ভ্যাট ইত্যাদি। অর্থনীতিবিদদের মতে, দেশের ৮০ শতাংশ করই পরোক্ষ কর। বাকিটা প্রত্যক্ষ কর। এখন এই পরোক্ষ করের পুরোটাই বহন করে সাধারণ জনগণ। যেমন একটা শার্ট বানাতে তুলা থেকে কাপড় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে যে ভ্যাট দিতে হয় তার দায় চূড়ান্ত অর্থে বহন করে একজন ক্রেতা। আবার আমদানি করেরও পুরো দায় গিয়ে পড়ে সাধারণ ক্রেতার ওপর। যেমন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) যে তেল আমদানি ও বিক্রয় করে তার ওপর সরকার ৩৭ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং ৩০ শতাংশ ভ্যাট বসিয়ে রেখেছে। বলাবাহুল্য, চুরির পাশাপাশি এই বিপুল কর দিতে গিয়েই বিপিসি এখন একটি লোকসানি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর পুরো দায়টা বহন করে কে ? সাধারণ জনগণ। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে কর্পোরেট আয়করের ক্ষেত্রে সরকার যে ট্যাক্স হলিডে সহ নানা সুবিধা কর্পোরেট হাউসগুলোকে দেয় তা আমরা জানি। আয়করের ক্ষেত্রেও এরা সরকারের কাছ থেকে ছাড় পেয়ে থাকে। যেমন গত বছরের বাজেটে যার আয় মাসে দশ হাজার টাকা, তাকে আগের বছরের চেয়ে ৩০০ টাকা বেশি আয়কর দিতে হয়েছে। অন্যদিকে, যার আয় বছরে ৭ লক্ষ টাকা তাকে দিতে হয় ১৫ হাজার টাকা কম। ফলে রাজস্ব আয়ের প্রত্যক্ষ করের অংশেও সাধারণ মানুষের অবদানই বেশি। কিন্তু যখন বাজেটে ব্যয়ের প্রশ্ন আসে তখন কে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় ? ওই ১০ লক্ষ লুটেরা ধনী মানুষ। যেমন উল্লিখিত পুস্তিকায় বলা হয়েছে, সরকার প্রতি বছর সরাসরি একটি ইউনিয়নে ১ কোটি টাকা ব্যয় করে। ২০০৪-০৫ অর্থ-বছরের বাজেটের মোট বরাদ্দকে ১৪ কোটি দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু বরাদ্দ দাঁড়ায় ৪,০৯০ টাকা। এ হিসাবে ৩০ হাজার জনগোষ্ঠী সংবলিত একটি ইউনিয়নের জাতীয় বাজেটের হিস্যা দাঁড়ায় ১২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। প্রশ্ন হল, ১১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা গেল কোথায় ?

২) বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি। সরকারি হিসাব মতে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী অর্থাৎ সাত কোটি মানুষ দরিদ্র। এর বিপরীতে আরেকটা চিত্র লক্ষণীয়। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ছিল হাতে গোনা দু'এক জন এবং তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠিন প্রতিযোগিতামুখী এবং বিপন্ন। বর্তমানে কোটিপতির সংখ্যা কত তা বের করা গবেষণার বিষয় বটে। শিল্প-কৃষি-সেবা, বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রতিটা সেক্টরে লুটেরা ধনীগোষ্ঠী সৃষ্টির প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। প্রতিটি সেক্টরে বছর বছর যেটুকু বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সে অর্থ প্রকৃত উৎপাদন ও জনকল্যাণের পরিবর্তে কোটিপতি সৃষ্টির কাজে সিংহভাগ ব্যয় হয়েছে। বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ যত বেশি শিক্ষা-স্বাস্থ্য নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, কোটিপতি হওয়ার প্রক্রিয়া ততই ত্বরান্বিত হচ্ছে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যও তাই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। সম্প্রতি স্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯৯-২০০০ অর্থ-বছরে ধনী-দরিদ্রের আয়ের ব্যবধান ছিল ২০ গুণ। কিন্তু গত সাড়ে ৪ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪.৫ গুণ। এ বছর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পে-স্কেল ঘোষণা করা হলেও শ্রমজীবী মানুষের জন্য আইন সহ ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার দাবি গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে উপেক্ষিত হয়ে চলেছে।

৩) সরকারি অবহেলা-উপেক্ষার শিকার দেশের কৃষি এবং কৃষিজীবী মানুষও। দেশের ৮০ ভাগ মানুষ সরাসরি কৃষির সাথে যুক্ত। শ্রমশক্তির ৬৩ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত। এ কথাটা সবাই বলেন যে কৃষিকে ঢেলে সাজাতে হবে। সরকারও কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনার কথা অহরহই বলে থাকে। কিন্তু বাজেটে কি এর কোনও প্রতিফলন ঘটে ? কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে প্রতি বছর কৃষিতে বর্ধিত বরাদ্দের দাবি করা হয়। কেউ বাজেটের ১২-১৮ ভাগ, কেউ উন্নয়ন বাজেটের ৪০ ভাগ বরাদ্দ দাবি করে। কিন্তু এর বিপরীতে সরকার ৩-৫ ভাগের বেশি বরাদ্দ করে না। দেশের মাত্র ৬.২ ভাগ পরিবার ৪০ ভাগ জমির মালিক হয়ে আছে। খাসজমির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি বিঘা। এর মধ্যে ব্যক্তিগত অবৈধ দখলে আছে ৪২ লাখ বিঘা, যার দাম প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা। এ জমি ভূমিহীনদের মাঝে সমবায়ের ভিত্তিতে বন্টন করা গেলে বেকারসমস্যার কিছুটা লাঘব ঘটত।

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত ধনবাদী দেশ কৃষিতে ভর্তুকি দিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের শাসকরা বাজার অর্থনীতির চ্যাম্পিয়ানের পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্য কৃষিতে ভর্তুকি তুলে দিয়েছে। আমাদের দেশে কৃষির প্রধান সমস্যা হচ্ছে, সার-বীজ-কীটনাশক ও সেচের জল কৃষকদের চড়া দামে বাজার থেকে ক্রয় করতে হয়, যার ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। অন্যদিকে, উৎপাদিত ফসল তাদেরকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের চাইতে কম মূল্যে বিক্রি করতে হয়। উৎপাদন খরচ ও বিক্রয়মূল্য এ দুটোর বিস্তর ফারাকের কারণে কৃষক অব্যাহতভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। আর কৃষকের থেকে কম দামে পণ্য কিনে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর ফড়িয়া-ব্যবসায়ী রমরমা ব্যবসা করে চলেছে।

কৃষিতে নতুন এক বিপদ যুক্ত হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউ টি ও)-র বিধান মেনে কৃষিকে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফা লোটার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার আয়োজন চলছে। এর ফলে কৃষিতে টার্মিনেটর বীজ খ্যাত জেনেটিক্যালি মডিফায়েড (জি এম) বীজের অনুপ্রবেশ ঘটছে, যার অনিবার্য পরিণাম হবে একদিকে দেশিয় বীজের অবলুপ্তি, অন্যদিকে বীজের জন্য বহুজাতিক দানবদের কাছে বাঁধা পড়ার কারণে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তারও বিপন্ন দশা।

৪) দুর্নীতি আমাদের অর্থনীতির এক অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহির্বিশ্বে আমাদের পরিচয় এখন দুর্নীতিবাজ দেশ হিসাবে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি-খাসজমি-জলাভূমি দখল, ঘুষ-দুর্নীতি, অস্ত্র ও মাদক পাচার, নারী ও শিশু পাচার, চোরাকারবারি, ব্যাঙ্কের ঋণ তছরুপ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে বিশাল এক কালো অর্থনীতি সৃষ্টি হয়েছে। এ কালো অর্থনীতি দৃশ্যমান অর্থনীতির প্রায় সমান্তরালেই চলছে। অর্থনীতিবিদদের মতে দেশে প্রতি বছর ৬০/৭০ হাজার কোটি কালো টাকার জন্ম হয়। সংবিধানের ২০নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রের কোন নাগরিক 'অনুপার্জিত আয়' (কালো টাকা) ভোগ করতে পারে না। সরকার সংবিধান মানলে তার প্রধান দায়িত্ব হল, এ অর্থ উদ্ধার করা এবং তা সৃষ্টির পথ বন্ধ করা। কিন্তু অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় এর ন্যূনতম প্রতিফলনও ঘটতে দেখা যায় না। বরং কালো অর্থনীতিকে সাদা করার অন্যতম পন্থা হচ্ছে বাজেট।

৫) আমাদের বাজেটে বিদেশি ঋণ-সাহায্য কতটুকু নেওয়া হয়েছে তার হিসাব থাকে, কিন্তু কীভাবে ঋণ-নির্ভরতা কমানো যায় তার পরিকল্পনা থাকে না। বছর ঘুরে বাজেট আসার অর্থই হচ্ছে আমাদের আরও এক ধাপ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়া। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ৪ বছর আগে হিসাব করে দেখিয়েছিলেন, দেশে ৩০ বছরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা ঋণ-সাহায্য এসেছে। কিন্তু তার ৭৫ ভাগ লুটপাট হয়ে গেছে। আরেক জন অর্থনীতিবিদ ডঃ শফিকুজ্জামান বলেছেন, দেশে প্রতিবছর বিদেশি ঋণ আসে ৭০০ মিলিয়ন ডলার। আর সুদ হিসাবে ফেরত যায় ৬৫০ মিলিয়ন ডলার। তিনি বলেছেন, আর কয়েক বছর পর ঋণের চেয়ে ঋণের সুদের পরিমাণ অনেক বেশি দাঁড়াবে। অথচ এই ঋণ নিতে গিয়ে সরকার বিশ্বব্যাঙ্ক-আই এম এফ-এ ডি বি প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার দেওয়া শর্ত মতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

লুটেরা শোষকশ্রেণীর বাজেট প্রত্যাখ্যান এবং জনগণের বাজেট প্রণয়নের দাবিতে 'গণমুক্তি ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা সম্মিলিত আন্দোলন'এর উদ্যোগে ২৮ জুন ঢাকার মুক্তাঙ্গনে এক সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাসদ আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন্ পথে

পাঁচের পাতার পর

আদমজী, চট্টগ্রাম স্টিল মিল সহ বড় বড় প্রায় সব শিল্প কারখানা বন্ধ করেছে, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিপন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং বিদেশি ঋণ মানে শুধু লুটপাট বা অপচয় নয়, এক ভয়ঙ্কর বিপদও বটে। কিন্তু একথা বলা হলেই সরকারি মহল থেকে অর্থের অভাবের কথা বলা হয়। কথাটা যে ফাঁপা বুলিমাত্র তার প্রমাণ হল, খোদ অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের জিডিপি-তে বিদেশি ঋণের অবদান ২ ভাগ মাত্র।

৬) বিদেশি ঋণের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ নিয়েও কিছু কথা বলা দরকার। বিদেশি বিনিয়োগ মানেই সকল শ্রম অধিকার-মানবাধিকার লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের ওপর যথেচ্ছ শোষণ-নির্যাতনের মালিকী অধিকার, কর শুল্ক মকুব, নামমাত্র মূল্যে জমি দান, জলের দামে গ্যাস-বিদ্যুতের সরবরাহ, বিনা প্রশ্নে মুনাফার বিপুল অর্থ দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা ইত্যাদি। এর পরিণাম যে দেশের পক্ষে কতটা ভয়াবহ তা বহু দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন। তাঁদের মতে, এর ফলে একদিকে দেশিয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হচ্ছে, অন্যদিকে বিপুল অর্থ বাইরে চলে যাচ্ছে। কাফকোর মতো শ্বেতহস্তীর উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে। এখন আবার টাটার বিনিয়োগের নামে আমাদের গ্যাস সম্পদ লুণ্ঠনের ভয়ঙ্কর এক আয়োজন চলছে। পরিস্থিতিটা এমন যে, দেশিয় পুঁজিপতিদেরও অনেকে এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, সরকার বিদেশিদের যেসব সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে তা তাদেরকে দেওয়া হয় না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, বিদেশি বিনিয়োগ না এলে শিল্পের পুঁজি আসবে কোত্থেকে ? দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদরা তারও জবাব দিয়েছেন। আমরা শুধু একটা কথাই উল্লেখ করতে চাই, আমাদের প্রবাসীরা বছরে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা রেমিট্যান্স পাঠায়। এ টাকা দ্বিগুণ হতে পারে শুধু হুন্ডি বন্ধ করতে পারলে। এই বিপুল অর্থ সরকার চাইলে প্রবাসীদের মাঝে শেয়ার-সার্টিফিকেট বা বন্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগে খাটাতে পারে। আমাদের প্রস্তাব হল, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জামাই আদর যদি দিতে হয় তাহলে প্রবাসীদের দেওয়া হোক। তাহলে কয়েক লক্ষ পরিবার তা থেকে লাভবান হবে। আর এর ফলে বর্তমানে প্রায় স্থবির আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিও খানিকটা গতি পাবে।

৭) আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই হচ্ছে নারী। এ নারীরা নানা ভাবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত রয়েছে। গ্রামীণ নারীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ কৃষিশ্রমিক হিসাবে কৃষি উৎপাদনের সাথে যুক্ত রয়েছে। যাঁরা কৃষিশ্রমিক নন, তাঁরাও কৃষির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। মোট কথা, গ্রামীণ নারীদের বাদ দিয়ে কৃষিকাজের কথা ভাবাই যায় না। নারীদের একটা অংশ এখন শহরের বিভিন্ন বাসা-বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া রান্নাবান্না, সন্তান লালনপালন সহ গৃহস্থালী কাজ মাত্রই নারীদের ওপর নির্ভরশীল। গার্মেন্টস সেক্টরে বিশাল সংখ্যক নারীর যুক্ত থাকার কথা সকলেরই জানা। কিন্তু অর্থনীতিতে নারীর অবদান কতটুকু, এ হিসাবটা কখনই করা হয় না। জিডিপিতে এ জনগোষ্ঠীর অবদানের পাওয়া যায় না কোনও স্বীকৃতি। অর্ধেক জনগোষ্ঠীর অবদানকে অস্বীকার করে বা তাকে হিসাবে না এনে বাজেট কতটুকু গণতান্ত্রিক হতে পারে ?

৮) শিক্ষাখাতে বরাদ্দ নিয়ে বিভ্রান্তির শেষ নেই। সরকারগুলো বরাবরই শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের দাবি করে আসছে। অর্থনীতিবিদ সহ শিক্ষানুরাগী মানুষেরা প্রতিবারই এ দাবি যে মিথ্যা তা হিসাব করে দেখিয়েছেন। তাঁদের মতে বাজেটে প্রকৃত অর্থে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পায় প্রতিরক্ষা খাত। এই প্রতিরক্ষা খাতে প্রতি বছর কত যে অর্থ খরচ হয় তার কোনও হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় না। অনেকেরই অভিমত, এ খাতে প্রচুর দুর্নীতি হয়। কিন্তু সরকার বা সংশ্লিষ্ট কোনও মহলই এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করে না। আমাদের দেশের ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে বাজেটের ২৫ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু তা কোনবারই ১২/১৩ ভাগের বেশি হয় না। কেবল তাই নয়, বরাবরই শিক্ষাখাতের সাথে ধর্মখাতকে যুক্ত করে বরাদ্দ হয়ে থাকে। যার ফলে শিক্ষাখাতে শেষপর্যন্ত বরাদ্দ কত তার হদিস পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। দুনিয়ার কোনও উন্নত ধনবাদী দেশেই রাষ্ট্রীয় অর্থে কোন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা চলে না। ধর্মীয় শিক্ষা পাওয়ার বা ধর্মচর্চার অধিকার সবারই আছে। তবে তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ধর্মের মানুষদের নিজস্ব অর্থে ও উদ্যোগে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কাউকে কোনও আনুকূল্য দেয় না। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মশিক্ষা (তা-ও সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেদের আধিপত্যাধীন) ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় ঘটে। সচেতন মহল থেকে বার বার তা বন্ধের দাবি জানানো হলেও কোনও সরকারই এ ব্যাপারে সদর্থক কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

৯) আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে বেশি কিছু বলার নেই। একদিকে সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতা অন্যদিকে ব্যাপক নৈরাজ্য, অব্যবস্থা ও দুর্নীতির কারণে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ মতে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে বছরে মাথাপিছু প্রায় ২ হাজার ১৪২ টাকা বা ৩৪ ডলার ব্যয় করার কথা, সেখানে সরকারিভাবে ব্যয় হচ্ছে মাত্র ৩৭৮ টাকা বা ৬ ডলার। সরকারি তথ্য মতে, বর্তমানে দেশে প্রায় ৩৪ হাজার রেজিস্টার্ড চিকিৎসক ও ১৭ হাজার নার্স রয়েছেন। এছাড়া ১৪ কোটি মানুষের জন্য সাকুল্যে চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র এক লাখ, অর্থাৎ প্রতি দেড় হাজার মানুষের জন্য রয়েছেন মাত্র একজন চিকিৎসক। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের রয়েছে দারুণ সঙ্কট। কেবল তাই নয়, স্বাধীনতার ৩৪ বছরেও দেশের কোনও সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করা যায় নি। বাসদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখার পর বারো দফা দাবি পেশ করা হয়।

গণবিক্ষোভে পঞ্চায়েতের টোলট্যাক্স বাতিল

সম্প্রতি তমলুক থানার নীলকুঠ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত মোরাম রাস্তার উপর ৮টি স্থানে নয়া পঞ্চায়েত উপবিধি চালু করে টোলট্যাক্স আদায় শুরু করে। সাইকেল ৫ টাকা, রিক্সাভ্যান ১০ টাকা, ট্যাক্সি ২০ টাকা, ট্রেকার ৪০ টাকা এবং বড় গাড়ির জন্য ৬০ টাকা টোলট্যাক্স আদায় শুরু হয়। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে ২৭ জুন পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে জনস্বার্থবিরোধী এই টোলট্যাক্স আদায় বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। দাবি না মানায় ৩ জুলাই গণকনভেনশনের মধ্য দিয়ে গঠিত নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে ৪ জুলাই দুই শতাধিক মানুষ অঞ্চল অফিস ঘেরাও করে। প্রবল বিক্ষোভের চাপে অঞ্চলপ্রধান ট্যাক্স আদায় করবেন না এবং চেকপোস্ট তুলে দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও উঠে যায়। পঞ্চায়েতের অন্যান্য ট্যাক্স প্রতিরোধে নাগরিক কমিটি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

পথ অবরোধে পুলিশের লাঠিচার্জ

তিনের পাতার পর

বর্ধমান

পাঁচ শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক বর্ধমান শহরের জনবহুল এলাকা কার্জন গেট সংলগ্ন জি টি রোড দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করে রাখেন। বাসযাত্রী, রিক্সাচালক সহ এলাকার সহস্রাধিক সাধারণ মানুষ প্রবল উৎসাহের সঙ্গে আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। অ্যাবেকা'র বর্ধমান জেলা সম্পাদক অশোক দাঁ বলেন, দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সহস্রাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক বহরমপুর গ্রান্ট হলের মাঠে জমায়েতে অংশ নেন। জমায়েতে সংগঠনের জেলা সভাপতি বাণী ইসরাইল, জেলা সম্পাদক কুণাল বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। একটি সুসজ্জিত দৃপ্ত মিছিল বহরমপুর চার্চের মোড়ে এসে পথ অবরোধের কর্মসূচিতে সামিল হন। শান্তিপূর্ণ এই অবরোধে পুলিশ বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ করলে অনুপ সিংহ, আব্দুল মজিদ এবং দিলীপ সেখ গুরুতরভাবে আহত হন। আরও ৩০ জন আন্দোলনকারী জখম হন। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ সংগঠনের অন্যতম নেতা দেবাশীষ চক্রবর্তী সহ ৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। ৪০ মিনিটে পথ অবরোধে জাতীয় সড়কে কয়েকশো গাড়ি আটকে পড়লেও জনগণ এগিয়ে এসে আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানান। শান্তিপূর্ণ এই আন্দোলনে পুলিশের নির্মম আক্রমণের প্রতিবাদে ২০ জুলাই জেলার সর্বত্র প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

পুরুলিয়া

পুরুলিয়া শহরের কোর্ট ও বাসস্ট্যান্ডের সংযোগস্থলে টাটা রোডে তিনশ' বিদ্যুৎগ্রাহকের উপস্থিতিতে এক ঘণ্টা পথ অবরোধ করা হয়। এই পথ অবরোধে উপস্থিত ছিলেন, অ্যাবেকার পুরুলিয়া জেলা সভাপতি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, প্রাক্তন পৌরপ্রধান তারকেশ্বর চ্যাটার্জী, জেলা সম্পাদক গৌতম হাটি সহ আরও অনেকে।

রঘুনাথপুর শহরে প্রায় ৭০০ বিদ্যুৎগ্রাহক এক ঘণ্টা পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান।

১৯ জুলাই পথ অবরোধ (উপরে) বর্ধমান, (মাঝে) বহরমপুর ও (নীচে) হাওড়া শহরে

কুলতলিতে কী ঘটেছিল ? সরেজমিন অনুসন্ধানকারীদের অভিমত

একের পাতার পর

আমরা সেখানে গিয়ে নারী-পুরুষ-যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কংগ্রেস (ই), এস ইউ সি আই, নিরপেক্ষ সাধারণ মানুষ সহ বিভিন্ন স্তরের বহু লোকের সাথে কথা বলে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ যা সংগ্রহ করেছি, তা নিম্নরূপ ঃ

আহত সদানন্দ ঘুঘু এবং ইব্রাহিম মোল্লার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের বিবৃতি থেকে জানতে পারি, ঘটনার সূত্রপাত ১৪ই জানুয়ারি। ঐ দিন রাত্রে এস ইউ সি আই-এর কিছু কর্মী কুলতলি থানার সিকিরহাট থেকে চ্যারিটি শো'র প্রচার সেরে যখন বাড়ি ফিরছিল সেই সময় কংগ্রেস(ই)'র কিছু দুর্বৃত্ত এস ইউ সি আই দলভুক্ত চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বসুদেব পুরকাইত যাচ্ছে মনে করে সদানন্দ ঘুঘুকে গুলি করে এবং অন্যান্যদের আহত করে। সদানন্দ ঘুঘু গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দুর্বৃত্তরা কাছে এসে দা দিয়ে গলা কাটতে গিয়ে টর্চের আলোতে সদানন্দ ঘুঘুকে দেখে বলে, ''আরে এ তো প্রধান নয়, কাকে মারতে কাকে মারলাম।'' ইতিমধ্যে গুলির শব্দ, আহতদের আর্তনাদ শুনে চারদিক থেকে দ্রুত গ্রামের লোকজন ছুটে আসতে থাকে এবং দুর্বৃত্তদের ধাওয়া করে। শেষপর্যন্ত খোঁজাখুঁজির পর কংগ্রেস(ই) দলভুক্ত আততায়ীদের দু'জন যথাক্রমে আব্দুর রহমান লস্কর এবং আব্দার মোল্লা আগ্নেয়াস্ত্র সমেত বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে ধরা পড়ে এবং মারা যায়।

সদানন্দ ঘুঘু কোন্ দলের কর্মী জিজ্ঞাসা করাতে তার পিতা জোরের সঙ্গে বলেন, সে আগে কংগ্রেস করত, গত এক বৎসর যাবৎ সক্রিয়ভাবে এস ইউ সি আই করছে। একথা স্থানীয় কংগ্রেসী ব্যক্তিরাও স্বীকার করেছেন।

কুলতলিতে উল্লিখিত দুই ব্যক্তির অবাঞ্ছিত হত্যা যে পরিকল্পিত নয়, তারা যে যথার্থই বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত জনরোষের বলি হয়েছে, একথা সরেজমিন তদন্ত করে সমস্ত দিক থেকে আমরা সুনিশ্চিত হয়েছি।

কুলতলি কেন্দ্রের জনপ্রতিনিধি প্রবোধ পুরকাইত যে ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না, পরে এসেছেন এবং উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন — তিনি না আসলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যে সম্ভব হত না — একথাও স্থানীয় সাধারণ মানুষ এবং স্থানীয় কংগ্রেসের কিছু কর্মীও স্বীকার করেছেন। তারা সকলেই বলেছেন, উত্তেজিত জনতার হাতে দুজন মারা গেছেন — এ কাজ কারুর নেতৃত্বে পরিকল্পিতভাবে ঘটেনি।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে ''**ছেলের রক্ত ভাতের সঙ্গে মাকে খাওয়ানো, নারী ধর্ষণ, নারী নিগ্রহ, শিশুকে জলে ফেলে দেওয়া'' এই ধরনের যে সমস্ত সংবাদ কোন কোন সংবাদপত্রে বেরিয়েছে তা যে কষ্টকল্পিত কাহিনী, এ সম্পর্কেও বিভিন্ন মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা সুনিশ্চিত হয়েছি।** এমনকী স্থানীয় কিছু কংগ্রেস কর্মীও এসব সংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। নারীধর্ষণ বা এ ধরনের কোন অভিযোগই তারা আমাদের কাছে আনেননি।

চুপড়িঝাড়া এস ইউ সি আই অঞ্চলপ্রধান শ্রীবসুদেব পুরকাইতের স্ত্রী লীলাবতী পুরকাইত এই হত্যা অভিযানে মহিলাদের নেতৃত্ব করেছেন বলে তাঁর নামে যে এফ আই আর করা হয়েছে, তাও সম্পূর্ণ অসত্য। কারণ, আমরা অনুসন্ধানে জানতে পারি, 'সিজারিয়ান' অপারেশনের মারফৎ সন্তান প্রসবের পর গত তিন মাস যাবৎ তিনি বাইশহাটা অঞ্চলের তালতলা গ্রামে পিত্রালয়ে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন।

আমাদের আরও অভিজ্ঞতা এই হত্যাকাণ্ডের পর কংগ্রেস(ই)'র পক্ষ থেকে বিশেষ করে **স্থানীয় কংগ্রেস(ই) নেতা শ্রীঅরবিন্দ নস্করের নেতৃত্বে এই এলাকায় চরম সন্ত্রাস ও অত্যাচার চলছে, যার ফলে ব্যাপক এলাকায় বহু পুরুষ গ্রামছাড়া, মেয়েরা সর্বত্র সন্ত্রাসের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, সম্পত্তি লুট করা, মারধোর করা, জোর করে টিপসই নেওয়ার বহু নজির উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শনকালে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।** এমনকী এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস(ই)'র পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক উস্কানিও দেওয়া হচ্ছে। এ সম্পর্কে তাদের একটি প্রচারপত্র আমাদের হাতে এসেছে। গত ১৯-১-৮৫ তারিখে আব্দুর রহমান লস্কর ও আব্দার মোল্লার মৃতদেহ এলাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় শ্রীঅরবিন্দ নস্কর মিছিলে নেতৃত্ব দেন এবং তাঁরই নির্দেশে এস ইউ সি আই সমর্থক এবং বহু সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি লুটপাট, মারধোর ও অত্যাচার হয়েছে বলে স্থানীয় সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন।

দুর্বৃত্তরা ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের বাড়ি আক্রমণ করে তছনছ করেছে, এমনকী এম এল এ প্রবোধ পুরকাইতের বাড়িতেও হামলা করেছে। প্রবোধ পুরকাইতের ছোট ভাই সুবোধ পুরকাইতের স্ত্রী অমলা পুরকাইত সহ বহু মহিলা — পুলিশ ও কংগ্রেসী দুর্বৃত্তদের নির্যাতনের বলি হয়েছেন। দুর্বৃত্তরা নলগড়া পঞ্চায়েত অফিস ও এস ইউ সি আই-এর স্থানীয় পার্টি অফিস ভেঙে কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছে, দেওয়ালে টাঙানো দেশ নেতাদের ছবি টেনে ফেলে দিয়েছে, ভুবনখালি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অনিরুদ্ধ হালদারের কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়েছে, ৮নং সোনাটিকরি নিবাসী গুরুপদ নাইয়ার বাড়ি সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছে, ধানের গাদায় আগুন দিয়েছে এবং টাকাপয়সা সহ সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গিয়েছে। স্থানীয় চৌকিদারের ছেলে হরিসাধন নাইয়া ঐ বাড়িতে আশ্রয় নিলে তাকে প্রচণ্ড মারধোর করেছে।

১৪ই জানুয়ারির যে ঘটনা থেকে পরবর্তী সমস্ত ঘটনার সূত্রপাত সে সম্পর্কে এবং ১৯শে জানুয়ারির কংগ্রেস(ই) মিছিলের তাণ্ডব ও অত্যাচারের ঘটনা সম্পর্কে প্রশাসন ও সংবাদপত্রের নিশ্চুপ ভূমিকা আমাদের বিস্মিত করেছে।

সমস্ত দেখেশুনে আমরা এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সাথে স্থানীয় এম এল এ প্রবোধ পুরকাইত, তাঁর স্ত্রী প্রভাবতী পুরকাইত, ছেলে বিশ্বজিৎ পুরকাইত (বয়স ১৫ বৎসর), অঞ্চল প্রধান বসুদেব পুরকাইত ও তাঁর স্ত্রী লীলাবতী পুরকাইতের কোন সম্পর্ক নেই।

হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক, দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস(ই)'র পক্ষ থেকে যে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া হচ্ছে, ব্যাপক সন্ত্রাস ও তাণ্ডব সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং কোন কোন সংবাদপত্রে যেভাবে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের মধ্য দিয়ে উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

এ পি ডি আর তথ্যানুসন্ধানী দলের কুলতলি পরিদর্শন

অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ্ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস্ (এ পি ডি আর) সংগঠনের প্রতিনিধিদল ৩রা ফেব্রুয়ারি কুলতলি পরিদর্শন করে ৭ই ফেব্রুয়ারি নিম্নলিখিত প্রেস বিবৃতি দেন—

কুলতলি থানায় এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় গত ১৪ই জানুয়ারি থেকে সুরু করে — ১৫ই জানুয়ারি আবদুর রহমান লস্কর ও আবদুর মোল্লার হত্যাকাণ্ড সহ — যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য এ পি ডি আর সম্পাদক দেবাশীষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সহ সম্পাদক দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী, কাউন্সিল সদস্য নব দত্ত, নন্দ রায়চৌধুরী, গোপাল মণ্ডল, বিভাস ব্যানার্জী, কার্তিক বসু, দুলাল ও শ্রীমতী বর্ণালী ভট্টাচার্য প্রমুখ ৯ জন সদস্যের একটি দল ৩রা ফেব্রুয়ারি উপদ্রুত গ্রামগুলি পরিদর্শন করে।

এ পি ডি আর সদস্যরা নিহত লস্করের পিতা ও নিহত মোল্লার শ্বশুরের সাথে বিস্তারিত ভাবে কথা বলেন। শোকার্ত পিতামাতারা হত্যার সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় এস ইউ সি আই সদস্যদের নাম করেন। কিন্তু, **কিছু কিছু সংবাদপত্রে ছেলের রক্ত ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে জোর করে মাকে খাওয়ানো বা কোন মহিলাকে হত্যা করতে গিয়ে তার শিশুকে হত্যার জন্য কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির সত্যতা সম্পর্কে তাঁরা কিছুই বলেননি।**

অসংখ্য গ্রামবাসী এ পি ডি আর সদস্যদের কাছে এই অভিযোগ করে বিবৃতি রেকর্ড করিয়েছেন যে, পুলিশ নির্বিচারে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করছে; ধৃত ব্যক্তিদের মারধোর করছে, মূল্যবান জিনিষপত্র ও টাকাপয়সা লুঠ করছে; জোর করে টাকা, মাছ ডিম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আদায় সহ অন্যান্য বাড়াবাড়ি পুলিশ করে চলেছে।

এগুলি ছাড়াও কংগ্রেস সমর্থকদের বিশেষ করে অর্থবানদের প্রতি পুলিশের ব্যাপক পক্ষপাতিত্বও এ পি ডি আর সদস্যরা লক্ষ্য করেছেন। যেসব ক্ষেত্রে কংগ্রেসীরা ভুক্তভোগী, পুলিশ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সেসব অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করছে; অথচ, সোনাটিক্রি গ্রামে এস ইউ সি আই সমর্থকদের বিরুদ্ধে — যাদের অধিকাংশই গরিব চাষী — আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা, যাতে প্রাক্তন কংগ্রেস এম এল এ নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে অভিযোগ, পুলিশ কোন ধর্তব্যের মধ্যেই আনছে না।

পুলিশের এই বাড়াবাড়ির ফলে গোটা অঞ্চলে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে এবং এ পি ডি আর সদস্যরা ভুবনখালি গ্রামে গিয়ে দেখেছেন যে, গোটা গ্রামের সমর্থ পুরুষদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, যার ফলে বাড়িগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

৫৮ জন মানুষকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়েছে এবং এদের সকলেই এস ইউ সি আই সমর্থক বলে দাবি করা হয়েছে। এ পি ডি আর সদস্যরা দেখেছেন যে, কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের অনেককেই আদালতে হাজির করার আগেই মারধোর করা হয়েছে।

এ পি ডি আর রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা এবং কুলতলিতে পুলিশি সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য বলছে। এ পি ডি আর দাবি করছে, বে-আইনি ও অত্যাচারী কার্যকলাপের জন্য দায়ী পুলিশদের ব্যক্তিগতভাবে শাস্তি দিতে হবে; রাজনৈতিক আনুগত্য নির্বিশেষে প্রতিটি অপরাধকেই অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে এবং কংগ্রেসের প্রতি পুলিশের ব্যাপক পক্ষপাতমূলক আচরণের অবিলম্বে প্রতিকার করতে হবে।

স্বাক্ষর
কপিল ভট্টাচার্য
সভাপতি, এ পি ডি আর

নিহতেরা জনরোষের বলি

আর এস পি

আর এস পি'র জয়নগর লোকসভা সদস্য শ্রীসনৎ কুমার মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ সংযুক্ত কিষাণসভার সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীঅশোক চৌধুরী, বিপ্লবী যুব সংস্থা নেতা শ্রীঅশোক ঘোষ ও ২৪ পরগণার কৃষক নেতা এল খাতের আলি কুলতলি থানার রাধাবল্লভপুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ১১-২-৮৫ তারিখে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন —

''আমরা ৭-২-৮৫ তারিখে কুলতলি থানার রাধাবল্লভপুর, সিকিরহাট, মনিরতট ও সন্নিহিত এলাকাগুলি ব্যাপকভাবে সফর করি এবং বহুল প্রচারিত জোড়া হত্যাকাণ্ডের উৎস ও বিস্তার সম্পর্কে নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে অনুসন্ধান চালাই। যেহেতু ঘটনাগুলি বিচারাধীন, সেহেতু বিচারাধীন মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা আমরা সমীচীন মনে করি না।

আমরা প্রথমে রাধাবল্লভপুরে ডাঃ শ্রীনিবাস রায়ের বাড়ি, নিহত আবদুর রহমান লস্কর ও আবদার মোল্লার বাড়ি গিয়ে ১৫ই জানুয়ারির ঘটনা ও তার পেছনের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করি। তাছাড়া কংগ্রেস, এস ইউ সি ও সিপিএম সমর্থক অসংখ্য লোকের কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ ও প্রতি-অভিযোগ শুনি। **ঘটনাগুলি সম্পর্কে এ যাবৎ বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তা অনেকাংশেই পরস্পরবিরোধী ও অতিরঞ্জিত বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা।** ঘটনার সূত্রপাত ১৪ই জানুয়ারি সন্ধ্যা-রাত্রে কংগ্রেস(ই) কর্তৃক এস ইউ সি কর্মী বলে পরিচিত কয়েকজনের ওপর আক্রমণ ও কয়েকজনের নিহত হওয়ার গুজবে সমস্ত এলাকায় তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এর পরদিন সকালে দুষ্কৃতকারীদের ধরবার জন্য উত্তেজিত জনতা বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে অনুসন্ধান করে, বাড়ি ভাঙচুর করে ও লুটপাট করে এবং ঐ উত্তেজিত জনতার হাতে আবদুর রহমান লস্কর ও আবদার মোল্লা নিহত হয়। **নিহত ব্যক্তির রক্তমাখা ভাত তার মাকে খাওয়ানোর প্রকাশিত বিবরণের কোন প্রমাণ আমরা পাইনি; উপরন্তু আবদুর রহমান লস্করের মাও একথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন। ঘটনার সঙ্গে কুলতলি কেন্দ্রের বিধায়ক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এমন নিরপেক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া গেল না।** ঘটনার পরবর্তী সময়ে রাধাবল্লভপুর, ঘটিহারানিয়া, চুপড়িঝাড়া, দেউলবাড়ী, দেবীপুর, মাধবপুর, গোপালপুর, সোনাটিকরী প্রভৃতি গ্রামের বহু বাড়িতে কংগ্রেসীরা ঐ ঘটনার বদলা হিসাবে সংঘবদ্ধভাবে লুটপাট ও মারধোর করেছে বলে অনেকে আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন। কিছু কট্টর মুসলিমপন্থী এই ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রং চড়িয়ে এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এমন কিছু ইস্তাহার আমরা ঐ গ্রামে পেয়েছি।

সমস্ত ঘটনাগুলি ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। আমরা এই সমস্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দাবি করছি।''

স্বাক্ষর ঃ এল খাতের আলি, অশোক চৌধুরী, সনৎ মণ্ডল, অশোক ঘোষ।

চা-শ্রমিকদের সমর্থনে ধর্মঘটের সাফল্যে জনগণকে অভিনন্দন

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক এক বিবৃতিতে চা-শ্রমিকদের আন্দোলনের সমর্থনে উত্তরবঙ্গের ৪ জেলার সাধারণ মানুষকে ১৯ জুলাই সর্বাত্মক ধর্মঘট সফল করবার জন্য সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, মালিকরা যেভাবে টালবাহানা করে চা-শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করতে চাইছে এবং মজুরি চুক্তির পথে বাধার সৃষ্টি করছে, তাতে রাজ্য সরকারকেই এগিয়ে এসে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে শ্রমিকদের মজুরি ঘোষণা করতে হবে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

কৃষিতে বর্ধিত বিদ্যুৎমাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে ১লা আগস্ট থেকে

বিদ্যুৎ বিল বয়কটের ডাককে সমর্থন জানাল এস ইউ সি আই

কৃষিতে বিদ্যুতের ব্যাপক দামবৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী ২০০৫-এর বিরুদ্ধে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। ১৯ জুলাই জেলায় জেলায় পথ অবরোধ হয়েছে। ১ আগস্ট থেকে কৃষকরা বিদ্যুৎ বিল বয়কট করবেন বলে জানিয়েছে অ্যাবেকা।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎনীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে চলেছে। অ্যাবেকার আন্দোলনের প্রতিও সমর্থন জানিয়েছে এস ইউ সি আই। এ প্রসঙ্গে দলের অভিমত ব্যক্ত করে ১৮ জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত ও গরিব চাষীরা যখন অত্যধিক খাজনা, পঞ্চায়েত ও নানা করভারে জর্জরিত, সার-কীটনাশক-ঔষধ সহ নানা দ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে এবং ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত, বারবার বন্যায় ও খরায় যখন কৃষি বিপর্যস্ত এবং এসবের ফলে কৃষকেরা ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ডিজেল-পেট্রলের ও রাজ্য সরকার কর্তৃক বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি এসেছে।

এমনিতেই শোষণে-সংকটে সর্বস্বান্ত হয়ে প্রতি বছরই হাজার হাজার চাষী জমিচ্যুত হচ্ছে, অনেকেই অনাহারে মারা যাচ্ছে, দুঃসহ যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করছে, উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় দাম কম হওয়ায় ফসল পুড়িয়ে দিচ্ছে। এই অবস্থায় বিদ্যুৎ ও ডিজেল-পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধি সংকটকে আরও তীব্রতর করে তুলবে। এর ফলে আরও লক্ষ লক্ষ গরিব ও মাঝারি চাষী জমি থেকে উৎখাত হবে এবং এইসব জমি ধীরে ধীরে ধনী চাষী, দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার কুক্ষিগত হবে এবং গ্লোবালাইজেশনের স্কীম অনুযায়ী গ্রামীণ কৃষি-ক্ষেত্রকে অধিক লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ২০ হাজার কৃষক বিদ্যুৎ ব্যবহার করে স্যালো টিউবওয়েল ও সাবমারসেবলের সাহায্যে চাষ করে, আরও কয়েক লক্ষ চাষী ডিজেল চালিত পাম্প সেট দিয়ে বোরো চাষ করে। কয়েক লক্ষ চাষী এদের কাছ থেকে জল কিনে চাষ করে। কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকবার ডিজেল-পেট্রলের দাম বাড়িয়ে এবারও আবার দাম বাড়িয়েছে। আর রাজ্য সরকার কৃষিতে প্রায় ১০০ শতাংশ মাশুল বাড়িয়েছে। কৃষিতে যেখানে তামিলনাড়ুতে বিনামূল্যে, অন্ধ্রে ২.৫ একর পর্যন্ত বিনামূল্যে ও পরবর্তী ক্ষেত্রে ইউনিট প্রতি ২০ পয়সায়, বিহার-হিমাচল প্রদেশ-গুজরাটে ইউনিট প্রতি ৫০ পয়সায় এবং পাঞ্জাবে ইউনিট প্রতি ২৫ পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া হয়, সেখানে সিপিএম শাসিত পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে ইউনিট প্রতি ৩.৫০ টাকা করা হয়েছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী বিভ্রান্তি সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যে মিথ্যা প্রচার করছেন যে কৃষকরা মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ নিলে দাম দাঁড়াবে ইউনিট প্রতি ১.৯০ টাকা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে কৃষকেরা বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও এবং বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বলা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এই মিটার চালু করা হয়নি। ফলে কৃষকরা বেশি দামে বার্ষিক চুক্তিতে বিদ্যুৎ নিতে বাধ্য হচ্ছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কৃষক বিক্ষোভে আতঙ্কিত হয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রচার করছে যে, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি এস ই বি করেনি, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন করেছে। অথচ কে না জানে যে সরকারের নীতি ও অলিখিত নির্দেশ অনুযায়ীই এই সংস্থা কাজ করে। সরকার চাইলেই বিদ্যুৎ আইনের ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার করতে পারে এবং ৬২(৩) ধারা অনুযায়ী সকল গরিব ও মধ্যবিত্তের মাশুল কমাতে পারে ও কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষ ও জনগণের স্বার্থে এইসব করা 'ত দূরের কথা বিদ্যুতে সাবসিডি দেওয়া বন্ধ করেছে, বিদ্যুৎশিল্পকে সম্পূর্ণ বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের দিকে এগোচ্ছে। গোয়েঙ্কা চালিত সি ই এস সি-তে অধিক লাভের সুযোগ দানের জন্য গৃহস্থ-গ্রাহকদের ইউনিট প্রতি গড়ে ৪০ পয়সা হারে দাম বাড়িয়েছে। বেসরকারীকরণের প্রস্তুতি হিসাবে ইতিমধ্যেই এস ই বি-তে ব্যাপক কর্মী সংকোচন করা হচ্ছে। গত ২৮ জুন বিধানসভায় 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী ২০০৫' পাশ করিয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে। **এই আইন অনুযায়ী বেসরকারী বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীরা নিজস্ব পুলিশবাহিনী গঠন করতে পারবে এবং বিদ্যুৎ চুরি করছে এই অজুহাতে যেকোন গ্রাহকের লাইন কেটে দিয়ে জামিনঅযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার, বিনা বিচরে ৩ মাস জেল, জরিমানা ও কারাদণ্ড দিতে পারবে এবং অন্যদিকে গ্রাহকদের আত্মরক্ষা ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারও থাকবে না।** বিদ্যুৎশিল্পে এই আইন কার্যকর করতে পারলে রাজ্য সরকার যে 'শিল্পে শান্তি রক্ষা'র অজুহাতে অন্যান্য শিল্পে ও দেশি-বিদেশি মালিকদের এই ধরনের পুলিশবাহিনী গঠনের অধিকার দিতে পারে, এই আশঙ্কা করা অমূলক নয়।

কমরেড প্রভাস ঘোষ জানান, কৃষকদের স্বল্পমূল্যে ডিজেল, ইউনিট প্রতি ৫০ পয়সা ও গৃহস্থ গ্রাহকদের ইউনিট প্রতি ১ টাকা দামে বিদ্যুৎ, স্বৈরতান্ত্রিক বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী প্রত্যাহার ইত্যাদি নির্দিষ্ট দাবিতেই আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এই দাবিতে ১ আগস্ট কৃষিতে বিদ্যুৎ বিল বয়কট করার কর্মসূচিকে সফল করার জন্য কৃষক সমাজের কাছে আবেদন জানাবার সাথে সাথে এই দাবিগুলিতে লাগাতার শক্তিশালী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বত্র সংগ্রাম কমিটি গঠন ও ভলান্টিয়ার সংগ্রহের জন্য গরিব ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের কাছে তিনি আহ্বান জানান।

চা-শিল্পে শ্রমিক বঞ্চনার চুক্তি
ইউ টি ইউ সি-এল এস স্বাক্ষর করল না

২৫ জুলাই সম্পাদিত 'চা-শিল্প চুক্তি' ধর্মঘটী তিন লক্ষ শ্রমিককে (যাঁরা বর্তমানে দৈনিক ৪৫.৯০টাকা মজুরি পেয়ে থাকেন) দারুণভাবে আঘাত করেছে শুধু নয়, তাঁদের আকাঙ্খার প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতাও করেছে। এই কারণে ইউ টি ইউ সি-এল এস অনুমোদিত নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। কারণ —

প্রথমত, প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী এই চুক্তি চালু হওয়ার কথা ছিল ২০০৩-এর ১ এপ্রিল থেকে, কিন্তু চালু করা হচ্ছে ২০০৫-এর ১ এপ্রিল থেকে। স্বাভাবিকভাবে আগের চুক্তির মেয়াদ লিখিতভাবে ৩ বছর থাকলেও কার্যত দাঁড়াল ৫ বছর। অর্থাৎ শ্রমিকরা দু'বছর মজুরিবৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হল। অন্যদিকে, এই দুই বছরে বিপুল হারে পণ্যমূল্যবৃদ্ধি ঘটলেও শ্রমিকদের মহার্ঘভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিকরা আর্থিক দিক থেকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এছাড়া, সাম্প্রতিক চুক্তিতে 'চুক্তির সময়সীমা' যেভাবে বাড়ানো হয়েছে, তা আগামীদিনে চা-শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি আদায়ের সংগ্রামে বিরাট বিপদের অশনি-সঙ্কেত হয়ে রইল।

দ্বিতীয়ত, বিগত ২০০০ সালে ৩ বছর মেয়াদি চুক্তিতে মজুরিবৃদ্ধি হয়েছিল ১১.১০ টাকা এবং বর্তমানে কার্যত ৫ বছর মেয়াদী চুক্তি দ্বারা মজুরিবৃদ্ধি ঘটল মাত্র ৮ টাকা। অথচ মজুরিবৃদ্ধির স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী মজুরিবৃদ্ধি হওয়া দরকার আগের চুক্তিতে যে হারে বৃদ্ধি ঘটেছিল তার থেকে বেশি হারে। সারা জীবনের জন্য দু'বছরের বর্ধিত মজুরি ও তজ্জনিত অন্যান্য প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এবং স্বীকৃত নিয়মে উপযুক্ত মজুরি বৃদ্ধি না করায় এই চুক্তিতে চা শ্রমিকরা চূড়ান্তরূপে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। ফলে এই চুক্তি প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকবঞ্চনার চুক্তি।

তৃতীয়ত, কিছু শব্দগত পরিবর্তন ও চাতুরি দিয়ে এই চুক্তির মাধ্যমে চা শিল্পে 'উৎপাদনভিত্তিক মজুরি' চালু হচ্ছে, যা অতীতে ছিল না। এর দ্বারা বৃহত্তর সংখ্যক চা-শ্রমিকের মজুরি কেটে নেওয়ার অধিকার মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হল। ফলে এই চুক্তিকে চূড়ান্ত শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী কালা চুক্তি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

চতুর্থত, সব ইউনিয়নকে সমগুরুত্বে অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে পছন্দের কয়েকটি ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করে এই চুক্তি সম্পাদিত হল। এই পদ্ধতি শ্রমিকস্বার্থের চূড়ান্ত পরিপন্থী ও অগণতান্ত্রিক।

পঞ্চমত, পশ্চিমবঙ্গে 'বাম রাজত্ব' থাকা সত্ত্বেও এই চুক্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গের চা-শ্রমিকরা কেরালা, তামিলনাড়ু ও আসামের শ্রমিকদের থেকে অনেক কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কী বিচিত্র বামপন্থা ! একে মালিকতোষণকারী চুক্তি ছাড়া আর কিছু বলা চলে কি ?

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী এবং নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এই চুক্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে আরও সচেতন, আরও সংগ্রামী এবং দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিতে সংগ্রামী চা শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

এস ইউ সি আই কর্মী খুন, কুলতলি বন্‌ধ

এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান ২৫ জুলাই এক বিবৃতিতে জানান ঃ

"গত ২৪ জুলাই বেলা ৩টায় কুলতলি থানার মহিষমারিতে সি পি এম দুষ্কৃতীরা গুলি করে এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড ইব্রাহিম মোল্লাকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। এর আগে ১৯৮৮ সালে কমরেড ইব্রাহিমের দুই ভাইকে সি পি এম খুন করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে সি পি এম নেতৃত্ব কমরেড ইব্রাহিমের উপর চাপ দিচ্ছিল, যাতে তিনি এস ইউ সি আই ছেড়ে সি পি এম-এ যোগ দেন ; কিন্তু কমরেড ইব্রাহিম সেই চাপের কাছে নতিস্বীকার না করায় ২৪ জুলাই জয়নগরের বামনগাছি থেকে বর্তমান বাসস্থান কুলতলির মহিষমারিতে ফেরার সময় কুপাখালি গ্রামে সি পি এম দুষ্কৃতীরা তাঁকে খুন করে।

২৫ জুলাই সকাল ৭টা নাগাদ অপর একটি ঘটনায় গোপালগঞ্জ অঞ্চলের ৬নং মধুসূদনপুর গ্রামের এস ইউ সি আই কর্মী রহিচ আলি লস্করকে সিপিএমের গুণ্ডারা কুপিয়ে টেঁড়স ক্ষেতে ফেলে রেখে যায়। ১৪ বছর আগে ইসলাম লস্করের বিধবা স্ত্রী নুরজাহান লস্করকে তৎকালীন এস ইউ সি আই পঞ্চায়েত থেকে দেওয়া ঘর থেকে বের করে দিয়ে সিপিএমের মুছা লস্কর ও কাজেম লস্করের নেতৃত্বে এক দল সশস্ত্র দুষ্কৃতী ঐ ঘরের দখল নিতে যায়। এস ইউ সি আই কর্মী এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে এগিয়ে এসে বাধা দিলে ঐ দুষ্কৃতীরা তাঁকে গুরুতররূপে জখম করে ফেলে রেখে যায়। উল্লেখ্য, ঐ বিধবা রমণীর স্বামী বাঘের আক্রমণে নিহত হন। রহিচ লস্করকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমরা অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।"

এই দুটি ঘটনা এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে ২৭ জুলাই কুলতলিতে ১২ ঘণ্টার বন্‌ধ পালিত হয়েছে।

সল্টলেক থানায় বিক্ষোভ

পর পর ডাকাতি ও নারীধর্ষণের ঘটনা, ২৪ জুলাই এক কিশোরীকে ডাকাতদল কর্তৃক ধর্ষণের প্রতিবাদে ও নাগরিক নিরাপত্তার দাবিতে এম এস এস, ডি ওয়াই ও এবং ডি এস ও-র পক্ষ থেকে ২৫ জুলাই সল্টলেক থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়, এস ডি পি ও-র কাছে উপযুক্ত পুলিশি ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in